GOVERNMENT OF INDIA.
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. Cd.
Book No. 909. 4.

N. L. 38.

MGIPC—S2—19 LNL—23-11-49—10,000.

NATIONAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.
MGIPC—S4—20 LNL—6-12-49—10,000.

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত

প্রথম ভাগ

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্ প্রণীত

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 44478
DATE 13/1/0
CALCUTTA

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীকালীনাথ সিংহ
১৩ নং নিকাশীপাড়া লেন.
কলিকাতা

hts reserved. ] [ মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কলিকাতা—
৬৪।১ ও ৬৪।২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

যাঁহার পরম শুভ আশীর্বাদ ও প্রীতিবলে

এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে

সাহসী হইয়াছি

সেই

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দজির করকমলে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম।

# গ্রন্থ পরিচয়।

যে সমস্ত সূত্র হইতে এই জীবনচরিতের ঘটনাবলী সংগৃহীত, তৎসমুদয় জানিবার পাঠকবর্গের সম্পূর্ণ অধিকার; এবং লেখক তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে তাহার পূর্ণ পরিচয় দানে বাধ্য। রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁহার বালব্রহ্মচারী-শিষ্যগণ সন্ন্যাসী হইয়া বরাহনগরে যখন একটী মঠ স্থাপন ও তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক সাধন ভজন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী নির্ম্মলানন্দ প্রভৃতি জনকয়েক তাঁহাদের গুরুদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রাম প্রথম দর্শন করিতে গমন করেন। তখনও তথায় রামকৃষ্ণের সমসাময়িক জনকয়েক লোক জীবিত। রামকৃষ্ণের জীবনের কতকগুলি ঘটনা তাঁহারা সেই সমস্ত নরনারীর নিকট সংগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল রামকৃষ্ণের সহিত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর কাল বাস এবং পরম যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। মাতুলের দেহত্যাগের পর হৃদয়ানন্দ মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া দুই চারি দিন বাস করিতেন এবং সেই অপূর্ব্ব জীবনের ঘটনাবলির গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে একান্ত মুগ্ধ করিতেন। মাতুলের ভাবভঙ্গী ধরণধারণ গলার স্বর প্রভৃতি হৃদয় অতি সুচারু ভাবে নকল করিয়া অভিনয় করিতে পারিতেন, কাজেই হৃদয় মঠে আসিলে যেন একটা উৎসব পড়িয়া যাইত, সকলেই তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার প্রাণমাতান গল্প করিতে বলিতেন। স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ঐ

সমস্ত গল্পের কতকগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন; এবং আপনারা যে সকল ঘটনা তাঁহাদের গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন তাহারও কতক কতক লিখিয়া রাখেন। ঐ খাতাখানি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। তাহার উপর ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত লিখিত জীবনচরিত, শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত জীবনচরিত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি এবং 'শ্রীম' লিখিত কথামৃত হইতেও কতকগুলি ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণ প্রত্যেকে কেমন করিয়া তাঁহার পবিত্র সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরই নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বয়ং আপন কাহিনী লেখককে লিখিয়া দিয়াছেন।

আবাল বৃদ্ধবনিতার পক্ষে সরল ও সুখপাঠ্য হয়, এমন গল্পচ্ছলে লিখিত একখানি জীবনচরিতের অভাব ছিল বলিয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করা হয়। সে অভাব কতদূর পূরণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে উদ্বোধনে যখন ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন কেহ কেহ ইহার একটু আদর করিয়াছিলেন; এই জন্যই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে লেখক সাহসী হইয়াছেন। যদিও বিশ্বস্তসূত্র হইতে ঘটনাবলী সংগৃহীত, তথাপি পাছে তাহাদের বিবৃতিতে কোন প্রকার ভ্রম বা কোন ঘটনার কোনপ্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এই ভয়ে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ জন্য যন্ত্রস্থ করিবার পূর্ব্বে উদ্বোধন হইতে সংগৃহীত সমস্ত পাণ্ডুলিপি স্বামী সারদানন্দের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক শিষ্যের সেই মহান্ জীবনের আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা জ্ঞাত থাকা অসম্ভব। এজন্য রামকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে ১৩১২ সালের ১লা

আশ্বিনের উদ্বোধনে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল, তৎসমুদায় তিনি পরিবর্ত্তিত করিয়া এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তি আমরা কামারপুকুর গ্রামে অবস্থান কালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেশীদিগের মুখে শুনিয়াছি।" কিন্তু উক্ত আশ্বিনের উদ্বোধনে প্রকাশ করা হয়, "এ প্রবাদ সকল ধর্ম্মেই আছে, এবং জড়বিজ্ঞানের এই চরমোৎকর্ষের দিনে রামকৃষ্ণ তাঁহার পাশ্চাত্যবিজ্ঞান পড়া শিষ্যদের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত এই-রূপই বলিয়াছিলেন।" সারদানন্দ স্বামী স্বকর্ণে তাঁহার গুরুদেবের মুখে কিন্তু একথা শুনেন নাই ; সুতরাং তিনি ইহা গ্রন্থকারের স্বক-পোল কল্পিত ভাবিয়া তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোদ্ধৃত ছত্রটি লিখিয়া দেন ; এবং পাণ্ডুলিপি তদবস্থায় যন্ত্রস্থ করা হয়। প্রথম ফর্ম্মা মুদ্রিত হইলে উহা লেখকের দৃষ্টিগোচর হইল। লেখক যে এ প্রকার মিথ্যা প্রচারে সাহসী হইয়াছিলেন তাহা কখনই হইতে পারে না। স্বর্গীয় স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য শিষ্যদের নিকট গ্রন্থকার নিশ্চয়ই এই কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সংস্কারও ভ্রান্ত কি না স্থির করিবার জন্য কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে পত্র লেখা হইল। কবিবর তখন স্বাস্থ্যের জন্য কাশীতে ছিলেন। উত্তরে কবিবরের পত্র লেখকের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিল। কবিবর লিখিয়াছেন,—

"বেনারস কান্টনমেণ্ট, ১৭ নবেম্বর, ১৯০৯।

"কল্যাণবরেষু –

আমি ঠাকুরের নিকট গল্প শুনিতেই ভালবাসিতাম। তিনি আমায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে তাঁহার মাতৃদেবী তাঁহার প্রতিবাসিগণকে বলেন, মহাদেবের মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, একটা হাওয়া

আমার পেটে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই আমার গর্ভের সঞ্চার হইয়াছে। প্রতিবাসীরা মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "দুর আবাগী ওকথা বলতে আছে!" ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার মাতৃদেবী হাবা ছিলেন, বলায় কি দোষ আছে, বুঝিতে পারিতেন না। অন্য ভক্তদের সহিত একথা লইয়া আমার তর্ক-বিতর্কও হইয়া গিয়াছে * * *।"

এই তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে স্বামী-বিবেকানন্দকে বলিতে শুনিয়াছি "পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সাম্‌নে জগতের অপরাপর ধর্ম্মগুলি যেন কুঞ্চিত ও হৃতপ্রাণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল গুণ্‌তিতে বাড়ছে। অবতারদের জন্মব্যাপারটী বৈজ্ঞানিক বিচারে এখনি বেশ যুক্তিসঙ্গত বলে বোঝান যায়।" ইহাতে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার গুরুদেবের জন্ম সম্বন্ধে তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতিকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারাও বলিলেন যে একথা তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা 'হাবা' অর্থাৎ বোকা সরল ব্যক্তি ছিলেন, কাজেই যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা কোনও প্রকার অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। লোকে যে তাঁহার কথা মিথ্যা মনে করিতে পারে, একথা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইত না। অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানা যায় তাহাতে রামকৃষ্ণের গর্ভধারণী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী এতই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে মানুষে মিথ্যা কথাও কহিয়া থাকে, এপ্রকার কুসংস্কারও তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না সন্দেহ। এবং এই জন্যই তিনি সরল ভাবে ঐ সমস্ত ঘটনা অবাধে সকলের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এ প্রকার প্রকৃতিতে যে মিথ্যা রচনার শক্তি ছিল তাহাও মনে হয় না। যাহা

হউক কামার পুকুরের কিম্বদন্তির ভিত্তিও চন্দ্রাদেবীর গল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই চন্দ্রাদেবীর যথাযথ প্রকৃতি রামকৃষ্ণ ব্যবহৃত বিশেষণ 'হাবা' কথাটীতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তবে কামার পুকুরের কিম্বদন্তির তুলনায় রামকৃষ্ণের নিজমুখের কথার গুরুত্ব অপরিমেয়। এই জন্যই একথার এইখানে উল্লেখ করা হইল।

রামকৃষ্ণের নিকট বহু লোক গমন করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন; তাঁহার এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁহারা আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহারাও হয়ত কত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কেহবা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা স্ব স্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায়* পাঠাইয়া দিলে শুধু যে লেখক পরম বাধিত হইবে তাহা নহে,তাহাতে জন সাধারণেরও পরম মঙ্গল সংসাধিত হইবে। কারণ রামকৃষ্ণদেব সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জনাই অবতীর্ণ। তাঁহার মহা সর্ব্বজনীন জীবনের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার সংগ্রহ ও তৎসমুদয়ের যথার্থ বিবৃতির সহিত প্রকৃত জীবন চরিত লিখিত হওয়া একজনের প্রয়াসে যে অসম্ভব তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাই লেখককে এই প্রয়াসে সহায়তা করিবার জন্যই তাঁহার ভক্তগণের চরণে উক্ত বিনীত প্রার্থনা। আজ কাল দেশের মঙ্গলকামনা সকল হৃদয়ে জাগরিত, সেই কল্যাণসাধনের শক্তি এই মহান জীবনে বর্ত্তমান; অতএব আশা হয় ভারতের মঙ্গলের জন্য তাঁহার ভক্তগণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লেখকের করজোড় প্রার্থনা পূরণে অগ্রসর হইবেন।

---

* কেয়ার অব্ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু, সচিব বিবেকানন্দ সমিতি,
৩৭ নং সিকদার বাগান লেন, কলিকাতা।

অতীতের নিবিড় আঁধারগর্ভস্থ বৈদিক যুগের ও তৎপরবর্ত্তী বিকশিত জাতীয়-ভাবসমূহ তাঁহার জীবনে যে প্রকার সুচারুরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত যেন আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের একটী ঘনীভূত পুনরাবৃত্তি ; এবং যেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের শক্তিসমূহ তাঁহাতে একীভূত হইয়াছিল। তাই মনে হয় যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ এই জীবনের আলোক হস্তে লইয়া ভারতের ইতিহাস-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন তবে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইতে পারে এই জন্যই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে, "রামকৃষ্ণ-জীবনের আলোক আমাদের সমস্ত লুপ্তবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করিবে।"

২৯শে ফাল্গুণ ১৩১৬
কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।

# সূচীপত্র।


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| পিতামাতা ও জন্ম কথা ... ... ... | ১ |
| বাল্যলীলা ... ... ... | ৮ |
| কলিকাতায় আগমন ... ... ... | ২২ |
| রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও রামকুমারের পৌরহিত্য গ্রহণ ... ... | ২৪ |
| রামকৃষ্ণের শ্রীশ্রীরাধাকান্তবিগ্রহের পূজার ভার গ্রহণ ... | ২৮ |
| ব্রাহ্মণীর আগমন ... ... ... | ৫৩ |
| তোতাপুরী ... ... ... | ৭৪ |
| "পরমহংস" আখ্যা ... ... ... | ৭৬ |
| অক্ষয়ের পীড়া ... ... ... | ৮১ |
| মথুরের পীড়া ... ... ... | ৮৭ |
| রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন ... | ৮৯ |
| শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর চরণ পূজা ... ... | ৯০ |
| প্রচার ও ভক্ত আহ্বান ... ... ... | ৯৪ |
| তীর্থযাত্রা ... ... ... | ১২৪ |
| দরিদ্রসেবা ... ... ... | ১৩৯ |
| প্রচার ... ... ... | ১৪২ |
| ভক্তসমাগম ... ... ... | ১৮০ |
| কেশব ... ... ... | ১৮০ |

| | |
|---|---|
| মনোমোহন ও রামচন্দ্র ... ... ... | ১৮৪ |
| সুরেন্দ্র ... ... ... | ১৮৭ |
| বলরাম ... ... ... | ১৯৪ |
| যোগীন্দ্র ... ... ... | ২০১ |
| নাগ মহাশয় ... ... ... | ২০৭ |
| রাখাল ... ... ... | ২১০ |
| নরেন্দ্র ... ... ... | ২১০ |
| নিরঞ্জন ... ... ... | ২১৫ |
| লাটু ... ... ... | ২২২ |
| হৃদয় মন্দির হইতে বিতাড়িত ... ... | ২২৭ |
| চিরকুমার শিষ্যদের সাধন শিক্ষা ... ... | ২২৯ |
| কাপ্তেন বিশ্বনাথের বিপদ ... ... | ২৩২ |
| রাখালের ভাব ... ... ... | ২৩৫ |
| লাটুকে পড়ান ... ... ... | ২৩৬ |
| রামের বাড়ী উৎসব ... ... ... | ২৩৭ |
| কাপ্তেনের সঙ্গে রামের পরিচয় ... ... | ২৩৮ |
| রামের প্রতি কৃপা ... ... ... | ২৪৭ |
| গোপালের মা ... ... ... | ২৪৮ |
| প্রতাপ হাজরা ... ... ... | ২৫৪ |
| মনোমোহনের অভিমান ... ... | ২৫৫ |
| মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... ... ... | ২৫৮ |
| ভক্ত ( একজন আহুত ভক্ত, এখন সন্ন্যাসী ) ... | ২৬৪ |
| নরেনের জন্য ব্যাকুলতা ... ... ... | ২৬৯ |
| দেবেন্দ্র মজুমদার ... ... ... | ২৭৩ |
| বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ... ... ... | ২৮৫ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বরাহনগরের বিষ্ণু | ... | ... | ... | ২৮৯ |
| ব্রাহ্মভক্তের বাড়ী নিমন্ত্রণ | ... | ... | ... | ২৯৩ |
| ব্রাহ্মসমাজে রামকৃষ্ণ | ... | ... | ... | ২৯৫ |
| শরৎ ও শশী | ... | ... | ... | ২৯৫ |
| বিবাহ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ | ... | ... | ... | ২৯৭ |
| যোগীনের বাল্যাবস্থা | ... | ... | ... | ৩০৪ |
| যোগীনের বিবাহ | ... | ... | ... | ৩০৭ |
| যোগীনের প্রতি কৃপা | ... | ... | ... | ৩১০ |
| বিদ্যাসাগরকে দর্শন | ... | ... | ... | ৩১১ |
| গিরিশচন্দ্র ঘোষ | ... | ... | ... | ৩১৯ |
| বলরাম বসুর বাটীতে | ... | ... | ... | ৩২৪ |
| থিয়েটারে গিরিশের সহিত মিলন | | ... | ... | ৩২৬ |
| রামচন্দ্রের বাটীতে | ... | ... | ... | ৩২৯ |
| সুবোধের মিলন | ... | ... | ... | ৩৩১ |
| নরেন্দ্রনাথের বাটীতে রামকৃষ্ণ | ... | ... | ... | ৩৪৭ |

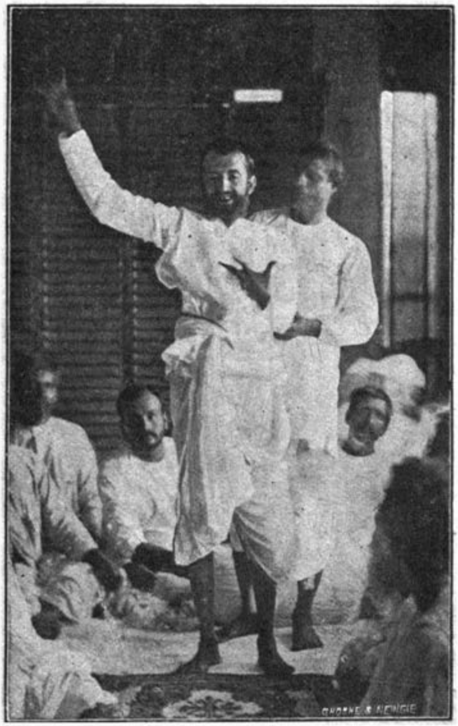

কেশবের বাটীতে

L. P. W. Calcutta.

BENGAL LIBRARY
5 - MAY 1910
WRITERS' BUILDINGS.

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত।

## পিতামাতা ও জন্মকথা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর নামক গ্রামে। তাঁহার কুটীরখানি গ্রামের সদর রাস্তার উপর। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র বটে, কিন্তু মহাতেজস্বী ও ত্যাগী; দিবানিশি আপনার গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। এই রঘুবীরের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দিন খুদিরাম কোন কার্য্যবশতঃ দূরদেশে গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে রৌদ্রে ও পথশ্রমে কাতর হইয়া একটী বটবৃক্ষমূলে শয়ন করিলে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয়। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর বালকবেশে তাঁহাকে আসিয়া বলিতেছেন, "আমি এইখানে অনাহারে পড়িয়া আছি, তুমি আমায় গৃহে লইয়া গিয়া আমার সেবা কর।" এই স্বপ্ন দেখিবামাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি ভাবিলেন, "স্থানটা একবার অন্বেষণ করিয়া দেখি, কি ব্যাপার।" অনেক অন্বেষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে না পাইয়া পুনরায় চিন্তা করিলেন, "যদি ব্যাপারটী সত্য হয়, আমি পুনরায় নিদ্রিত হইলে পুনরায় ঠাকুর আমায় স্বপ্নে তিনি

কোন্ স্থানে আছেন, ঠিক জানাইয়া দিবেন।" খুদিরাম এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যে স্থলে শুইয়া আছেন, তাহার সন্নিকটে ঠাকুর মাটীর ভিতর অর্দ্ধপ্রোথিত ভাবে ঘাসে আবৃত আছেন। খুদিরাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এক কাল-ফণী ফণা বিস্তার করিয়া একটী শালগ্রাম শিলাকে ক্রোড়ে করিয়া রক্ষা করিতেছে! খুদিরাম ভীত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের বিষয় মনে হইল, ভাবিলেন, "ভগবান্ নিজে সেবা কত্তে বল্‌ছেন, তখন সাপকে ভয় কি?" তিনি হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র কালফণী অন্তর্হিত হইল। তিনি শালগ্রাম শিলাটী উঠাইয়া অতি যত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া দ্রুতপদে নিজ গৃহে আসিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন রঘুবীর। তদবধি খুদিরাম রঘুবীরের সেবায় কায়-মনোবাক্যে নিযুক্ত। এত দারিদ্র্য সত্বেও তিনি আজন্ম কোন প্রকার বিষয়কর্ম্ম, ভিক্ষা বা শূদ্রের নিকট দান পরিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার কুটীরের কিয়দ্দূরে অতি সামান্য একটুকরা ধানজমি। সেই জমিতে তিনি 'রঘুবীর রঘুবীর' বলিয়া ধান ছড়াইয়া দিতেন, এবং তাহাতেই যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাই তাঁহার সংসারের সম্বৎসরের সংস্থান। উক্ত জমিতে অজন্মা কখনও হয় নাই।

গ্রামের জমিদার লাহাদের একটী অতিথিশালা আছে। এই পথে গমনকালে সাধু সন্ন্যাসীরা সেই খানেই বিশ্রাম ও গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সাধু অতিথিরা কিন্তু খুদিরামের বাটীতে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষাদি পান, এরূপ আর কোথাও পান না। কাজেই এমন দিন নাই যে,খুদিরামের বাড়ীতে দুই একজন অতিথি নাই। খুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী এই সকল অতিথির জন্য

রন্ধন ও ইঁহাদের পরিচর্য্যা স্বহস্তে করিতেন, এজন্য প্রত্যহই তাঁহার আহার করিতে অপরাহ্ণ হইয়া পড়িত। অতিথিগণের সেবা করিয়া, পথের ধারে দণ্ডায়মান হইয়া দরিদ্র অভুক্ত আর কেহ আছে কি না সংবাদ লইয়া, তৎপরে তিনি স্বয়ং ভোজনে বসিতেন। এই সকল ঘটনা আশি নব্বই বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত। কিন্তু অদ্য কালমাহাত্ম্যে এরূপ অতিথি ও অভুক্তের সেবা অলীক স্বপ্নবৎ মনে হয়।

খুদিরামের দুই পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম রামকুমার, দ্বিতীয় রামেশ্বর এবং কন্যাটীর নাম কাত্যায়নী। নিধিরাম ও কানাই খুদিরামের দুই ভ্রাতা এবং রামশীলা তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনী। রামশীলার স্বামী দেরেপুর-নিবাসী ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাদের একমাত্র পুত্রের নাম রামচাঁদ ও একটী মাত্র কন্যার নাম শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী। হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে জন্ম হয়। খুদিরাম তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং নিজ কন্যাবৎ আপনার সন্তানগণের সহিত পালন করেন। খুদিরামের প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান মারা যান এবং খুদিরাম দ্বিতীয়বার সরাটি মায়াপুরে বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সন্তানগণ প্রায় সকলেই উপযুক্ত এবং হেমাঙ্গিনীকে তাঁহারা সহোদরা ভগিনীর মত ভাল বাসিতেন। রামচাঁদকেও খুদিরাম খুব ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে যাইতেন। একবার অনেক দিন ধরিয়া রামচাঁদের কোনও সংবাদ না পাইয়া সংবাদ লইবার জন্য মেদিনীপুরে যাত্রা করেন। গন্তব্যস্থানের দিকে কয়েক ক্রোশ যাইয়া একটি নবীন অচ্ছিন্ন পত্রপূর্ণ বেলগাছ দেখিতে পাইয়া ঐ সুচারু বিল্বদলে শিবপূজা করিবার প্রবল বাসনা জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি নিকটস্থ বাজারে যাইয়া একটী বড় চুবড়ী ও একখানি

গামছা ক্রয় করিয়া আনিলেন, ও অন্বেষণ করিয়া একটী পুষ্করিণীতে সেই গামছা ও চুব্ড়ী ধৌত করিলেন। চুব্ড়ী বিল্বপত্রে পরিপূর্ণ, তদুপরি জলসিক্ত গামছাটী আচ্ছাদন করিয়া তাহা শিরোপরি ধারণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্নে গৃহে উপস্থিত হইয়া স্নানান্তে পূজায় বসিলেন। পূজান্তে জলযোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে বাটীর সকলে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "এই সুন্দর বিল্বপত্রগুলি দিয়া শিবপূজা করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলাম না, তাই ফিরিয়া আসিলাম। আহারান্তে এখনই যাব।" এই বলিয়া আহার করিয়া আবার মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। তাঁহার এখন প্রৌঢ়াবস্থা। আজীবন ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অধিক বয়সেও কঠোর পরিশ্রমে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। অদ্যাপিও কামার পুকুরে তাঁহার তপঃপ্রভাবের কাহিনী প্রাচীন লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রামবাসী তাঁহার গুণে বড়ই বশীভূত ছিল ও তাঁহাকে এরূপ শ্রদ্ধা করিত যে, তিনি যতক্ষণ "হালদার পুকুরে" স্নান করিতেন, ততক্ষণ কেহ সেই পুষ্করিণীর জলস্পর্শে সাহসী হইত না। আরও কথিত আছে যে, কেহ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্যও তাঁহার পদস্পর্শে সাহস করিত না। খুদিরামের আকৃতি লম্বা, শরীর সুকোমল কিন্তু কৃশ, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী উত্তমকান্তি-বিশিষ্ট, তিনি অতি মিষ্টভাষী ছিলেন, জীবনে কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

একদিন খুদিরাম তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা কাত্যায়নীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন; সকলে বলে উপদেবতাগ্রস্ত। খুদিরাম দেখিতে গেলেন। কন্যার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

"ভূতই হও বা কোন উপদেবতাই হও, এখনি আমার কন্যাকে ছেড়ে দেও, আর কষ্ট দিও না।" তেজস্বী ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় উপদেবতা উত্তর করিল, "আমি আপনার কন্যাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গয়ায় গিয়ে আপনি দয়া কোরে আমায় পিণ্ড দিয়ে উদ্ধার করুন।" এই বলিয়া সে আপনার নাম গোত্রাদি তাঁহাকে জানাইল। খুদিরাম গয়াধামে যাইতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি উদ্ধার হ'লে আমরা কি প্রকারে জান্‌তে পারিব?" ভূত বলিল, সে নিকটস্থিত নিম্ববৃক্ষে যে শাখায় বাস করে, গয়াধামে শ্রীবিষ্ণুপদে তাহার পিণ্ড দিবামাত্র সেই শাখাটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং যখনি খুদিরাম গয়াধামের জন্য যাত্রা করিবেন, তৎক্ষণাৎ কাত্যায়নীকে ছাড়িয়া যাইবে। খুদিরাম বলিলেন, তিনি পরদিনই যাত্রা করিবেন। তাঁহার আত্মীয়গণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "আপনি যৌবনাবস্থায় পদব্রজে রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বয়সে আর আপনার পদব্রজে গয়াধামে যাইবার সঙ্কল্প করা উচিত নহে।" এইরূপ নানাযুক্তিসহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া সকলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেও তিনি সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পরদিন প্রত্যুষে গয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে কাত্যায়নীও সুস্থ হইলেন। গয়াধামে উপস্থিত হইয়া খুদিরাম যেদিন যে সময়ে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলেন, কথিত আছে, এখানেও ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত নিম্ববৃক্ষের শাখাটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

পিণ্ডদান করিলে গয়াধামে তিন দিবস বাস করা বিধি। খুদিরাম সেই বিধিমত গয়াধামেই আছেন; একদিন রজনী-প্রভাতসময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, ভগবান্ নবযৌবনসম্পন্ন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত এবং মৃদু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি

তোমার পুত্র হ'য়ে জন্মাব।" খুদিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি দরিদ্র, তোমার সেবা কেমন ক'রে করব ?" ভগবান্ উত্তর করিলেন, "তোমার সেজন্য চিন্তার আবশ্যক নেই।" খুদিরাম জাগ্রত হইয়া অপার চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। ঠিক সেই দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাহ্নে চন্দ্রাদেবী তাঁহার সুপরিচিতা দুইটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাটীর অনতিদূরে একটী শিবালয়ের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, শিবালয়ের দিক্ হইতে একটী জ্যোতি বায়ুতে পরিণত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। তিনি অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয়কে সকল কথা জানাইলেন। এই দুই সঙ্গিনীর মধ্যে একজনের নাম ধনী কামারণী, ইনি চন্দ্রাদেবীর কথা বিশ্বাস করিলেন ; অপর স্ত্রীলোকটী ভাবিলেন, বোধ হয় চন্দ্রাদেবীকে ভূতে পাইয়াছে। গয়াধাম হইতে খুদিরাম বাড়ী আসিলে চন্দ্রাদেবী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা জানাইলেন, এবং খুদিরামও সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রাদেবীকে নিজ স্বপ্নের কথা জানাইয়া কহিলেন, "দেখ, এ কথা খুব গোপন রেখো, কোন মতে প্রকাশ কোরো না এবং কোন ঘটনায় ভীত হয়ো না।" অবতারগণের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ অপূর্ব্ব কিম্বদন্তি সকল ধর্ম্মেই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তি আমরা কামারপুকুর গ্রামে অবস্থানকালে চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবেশীদিগের মুখে শুনিয়াছি। দিন দিন চন্দ্রা-দেবীর গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি অপরূপ-রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে ভাবিলেন, "এঁর এত বয়সে গর্ভ, তাতে এত রূপ, হয়ত মাগী এইবারে মরবে।" এই সময়ে তিনি অনেকপ্রকার অদ্ভুত

ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন নানা দেবদেবীর দর্শন পান, কখন দেখেন, গোপাল নূপুর পায় দিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছেন। একদিন তিনি আপন কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে সুমধুর নূপুরধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি চমকিত হইয়া ঘরের চারিদিক্ অন্বেষণ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তৎপরে দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, ঘরে কেহই নাই, অথচ সেই নূপুরধ্বনি, যেন কেহ নূপুর পরিয়া তাঁহার অতি নিকটে নৃত্য করিতেছে! কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহার স্বামীকে সমস্ত কথা জানাইলেন। খুদিরাম তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এই সকল এবং আরও অনেক ঘটনা হবে আমি জানি, এতেই আরও বোধ হয়, আমাদের আশা পূর্ণ হবে। তুমি ভয় পেয়ো না, ভয়ের কোনও কারণ নাই।" খুদিরাম সর্ব্বদা তাঁহাকে এই প্রকার বুঝাইতেন এবং এই বিষয় কাহারও সহিত চর্চ্চা করিতে নিষেধ করিতেন। স্ত্রীস্বভাব-বশতঃ চন্দ্রাদেবী তথাপি তাঁহার বন্ধুগণের সঙ্গে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও এই সকল বিষয়ে গল্প করিতে ছাড়িতেন না।

এইরূপে দশমাস অতীত হইলে ১৮৩৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে চন্দ্রাদেবী স্বামীকে জানাইলেন যে, তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত। খুদিরাম বলিলেন, "সে কি কথা! তুমি আগে রঘুবীরের ভোগ রাঁধ, তাঁর সেবা হোক্ তবে, এখন কেমন ক'রে প্রসব হবে?" স্বামীর কথা শিরোধার্য্য করিয়া চন্দ্রাদেবী রঘুবীরের ভোগ রাঁধিলেন, তাঁহার সেবান্তে এবং সকলের আহারান্তে বেলা সাড়ে চারিটার সময় শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্ম হইল। খুদিরামের আর আনন্দের সীমা রহিল না। "আমাদের কি সৌভাগ্য, আজ গদাধর স্বয়ং আমাদের সন্তানরূপে এসেছেন!" এই কথা বলে

করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রাদেবী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন, মরেন নাই শুনিয়া গ্রামস্থ স্ত্রীলোকগণ উপস্থিত হইলেন এবং সূতিকাগারে উঁকি মারিয়া নবজাত গদাইএর মুখচন্দ্র দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। আর পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "যেন ছয়মাসের ছেলে, কি বলিষ্ঠ, কি রূপ, সদ্যোজাত ছেলে ত আমরা এমন কখন দেখিনি! আহা, চোক ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় রাত দিন দেখি!" ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত ধনী কামারণী আসিয়া জুটিয়াছে। সে প্রসূতি ও প্রসূতের সেবায় স্বেচ্ছায় নিযুক্তা। ক্রমে নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও চন্দ্রাদেবীর সন্তান হইয়াছে দেখিবার জন্য এবং চন্দ্রাদেবী বাঁচিয়া আছেন কি না, জানিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠীপূজাতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। এখন হইতে তাঁহারা গৃহকার্য্যগুলি তৎপর সারিয়া লইয়া গদাইকে কোলে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিতেন এবং গদাইও সকলের কোলে যাইতেন। যিনি একবার সেই সুন্দর শিশুটীকে কোলে করেন, তাঁহার আর তাঁহাকে অপরের কোলে দিতে ইচ্ছা হয় না।

---

# বাল্যলীলা

প্রতিদিন বৈকালে প্রতিবাসিনী রমণীগণ রামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিতেন এবং বলিতেন, "কি আশ্চর্য্য! একে রোজ রোজ দেখিতে ইচ্ছা হয়।" দশকর্ম্মান্বিত রামকুমার স্বস্ত্যয়ন কার্য্য করিতেন, ইহাতে

তাঁহার অতি অল্পই আয় হইত; কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার উক্ত কার্য্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামকুমার রোগীকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিতেন, সে বাঁচিবে কি না, এবং যদি বাঁচিবার লক্ষণ দেখিতেন, তবেই তাহার স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। রামচাঁদ তাঁহার মাতুল মহাশয়কে প্রতিমাসে পনের টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন এবং নবজাত শিশুর জন্য একটী দুগ্ধবতী গাভী দিয়াছিলেন। সুতরাং খুদিরামের সংসারে আর কোনও অভাব ছিল না।

খুদিরামের নিশ্চিত ধারণা যে, তাঁহার নবজাত পুত্রটী স্বয়ং ভগবান্; এবং ৺ গয়াধামে শ্রীগদাধরের স্বপ্ন স্মরণ করিয়া শিশুকে গদাধর বা গদাইচাঁদ বলিয়া ডাকিতেন। গদাই ভূমিষ্ঠ হইবার পর নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। চন্দ্রাদেবী সময়ে সময়ে ঐ সকল ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেন, উহা ভৌতিক ব্যাপার; এবং নবজাত পুত্রের পাছে অকল্যাণ হয়, এজন্য রোজা ডাকাইয়া তৎপ্রতিকারে ব্যস্ত হইতেন।

রামকৃষ্ণ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। ছয়মাসে পড়িলে তাঁহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণের দিন স্থির হইয়া গেল। গ্রামস্থ প্রবীণ লোকেরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই উপলক্ষে সমগ্র গ্রামের লোকদিগকে সমারোহ করিয়া ভোজনাদি করাইতে অনুরোধ করিলেন। খুদিরাম প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রতিবেশীরা বিশেষ অনুরোধ করায় সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গতিপন্ন ভাগিনেয় রামচাঁদের সাহায্যে স্বগ্রামস্থ অনেকগুলি লোক, আপনার যাবতীয় আত্মীয়গণ এবং নিকটবর্ত্তী দুই চারিখানি গ্রামের পরিচিত ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। পরম দয়ালু

খুদিরাম এই সঙ্গে অনেকগুলি কাঙ্গালিকেও বিশেষ যত্নের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন। বালকের নাম রাখা হইল রামকৃষ্ণ, কিন্তু খুদিরাম পুত্রকে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া গদাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন, কাজেই অন্যান্য সকলেও বালককে ঐ নামেই ডাকিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইলে এক দিবস চন্দ্রাদেবী নিদ্রিত গদাইচাঁদকে মশারির মধ্যে বিছানায় শয়ন করাইয়া স্নানে গমন করেন। স্নানান্তে আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুত্র নাই, তাহার স্থানে পাঁচ সাত বৎসরের এক বালক শয়ন করিয়া আছে। চন্দ্রাদেবী ভয়ে অধীর হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ছেলেকে ভূতে পেয়েছে, ওঝা এনে দেখাও।" খুদিরাম কিন্তু পূর্ব্ববৎ বিচলিত না হইয়া কহিলেন, "চুপ কর, গোল ক'র না; আমি জানতে পেরেছি, ইনি সাধারণ ছেলে নন। তুমি ভেবো না। ঘরে রঘুবীর আছেন, তিনি রক্ষে করবেন।"

ক্রমে দিন, মাস, বৎসর অতীত হইতে লাগিল। ধনী কামারণী প্রায় সর্ব্বদাই চন্দ্রাদেবীর নিকটে থাকিয়া বালককে সাক্ষাৎ গোপাল জ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিত। এইরূপে গদাই দিনদিন বড় হইতে লাগিলেন; তাঁহার রংটী গৌর, গঠন অতি কোমল কিন্তু কৃশ, মুখে সর্ব্বদাই আনন্দমাখা, আর মাথায় বালিকাদের ন্যায় দীর্ঘ কেশ। যে একবার দেখে, সেই ভালবাসে; গ্রামের ছেলেরা সকলে গদাইকে ভাল বাসে, ও তাঁহার সঙ্গে খেলায় পরমানন্দ পায়। গ্রামের রমণীগণ গদাইচাঁদকে স্বহস্তে খাওয়াইতে ভালবাসেন, অনেকে বাটীতে নূতন কোন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে গদাইকে না খাওয়াইয়া আপনারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না এবং আপন

সন্তানদেরও দিতে পারেন না। যাঁহাদের বাটী একটু দূরে, তাঁহারা দিনান্তে একবারও আসিয়া গদাইকে কিছু খাওয়ান জীবনের একটী অত্যাবশ্যক কার্য্য জ্ঞান করিতেন। গদাইও ক্রমে নিজ পল্লীতে, পরে সমগ্র গ্রামের লোকের বাটী যাইয়া সকলের সঙ্গে নানাপ্রকার ক্রীড়া, গান ও গল্প করিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পল্লীগ্রামে বালকেরা দল বাঁধিয়া কেহ আপন বস্ত্রপ্রান্তে, কেহ বা একটী ছোট ধামিতে মুড়ি খাইতে খাইতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও খেলা করিয়া বেড়ায়। গদাইও সেইরূপ মুড়ি খাইতে খাইতে গ্রামপ্রান্তে মাঠে যাইয়া সমবয়স্কদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার লীলা করিতেন। কখন কখন গদাই বাটীতে কাহাকেও কিছুই না বলিয়াই সমবয়স্কদের সহিত চলিয়া যাইতেন; তাঁহার মাতা চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন। কখন বা গদাই মাঠে যাইয়া রাখাল বালকদের সহিত গোষ্ঠলীলা করিতেন; তাহাদের শ্রীদাম সুদাম সাজাইয়া এবং আপনি কৃষ্ণ সাজিয়া গোচারণ করিতেন। কোমল তৃণ তুলিয়া ধেনুগণকে খাওয়াইতেন; এবং মিঠাই মুড়কি ক্রয় করিয়া রাখাল বালকদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিতেন। একদিন ঐরূপে মুড়ির ধামিটি লইয়া মাঠের আলিপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একখানি নবীন মেঘের উদয় হইল ও তাহার ক্রোড়ে বক উড়িতে লাগিল। গদাই সেই নবজলধরের নিবিড় কৃষ্ণকান্তি ও তাহার ক্রোড়ে বক অবলোকন করিতে করিতে নিস্পন্দ ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান—হস্তস্থিত ধামির মুড়িগুলিও ভূতলে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পুনরায় বাহ্যজ্ঞান আসিলে তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসা হয়। তখন তাঁহার বয়স ৬।৭ বৎসর মাত্র। ইহাই গদাইয়ের জীবনে ভাবসমাধির প্রথম বিকাশ। যেখানে যাত্রা বা রামায়ণ গান

হয়, গদাই সর্ব্বাগ্রে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন, এবং একবার যাহা শ্রবণ করেন, জীবনে আর তাহা বিস্মৃত হন না। এইজন্য কৃষ্ণলীলার ও রামায়ণের পালাগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ; মাঠে বালকদিগকে লইয়া গদাই সেই সকল গান ও যাত্রার পুনরভিনয় করেন। গ্রামের কেহ কেহ অন্তরাল হইতে বালকদিগের এইরূপ ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেন।

প্রতিবৎসর গ্রামের জমিদার লাহাদের ধর্ম্মশালায় অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। এই সময়ে গদাই প্রায়ই বাটীতে আহার করিতেন না; অতিথিশালায় উপস্থিত হইয়া সাধুসন্ন্যাসীদের ধর্ম্মচর্চ্চা শ্রবণ ও সেবা করিতেন; এবং তাঁহারা গদাইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অতি যত্ন সহকারে তাঁহাকে আপনাদের ভিক্ষান্ন ভোজন করাইয়া অঙ্গে তিলকবিভূত্যাদি লেপন করিয়া দিতেন। একদিন গদাই আপনার নূতন পরিধেয় বস্ত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্ন্যাসীদের ন্যায় কৌপীন করিয়া পরিয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মা, আমি কেমন সাধু হইয়াছি দেখ।" নূতন কাপড়খানি নষ্ট করিয়াছে দেখিয়া সকলের তিরস্কার করিবার ইচ্ছা হইলেও বালকের আনন্দ ও সাধুর বেশে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছে দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

কামারপুকুর হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে ভূরশোভা বা ভূরসুবা নামে এক গ্রাম আছে। তথায় মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বিখ্যাত দাতা ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার সহোদর রামজয় খুদিরামের পরমবন্ধু ছিলেন। ইঁহারা প্রচুরসঙ্গতিশালী জমিদার এবং সেই নিমিত্ত সকলে মাণিকচন্দ্রকে মাণিকরাজা বলিত। খুদিরাম

প্রায়ই গদাইকে লইয়া তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন। গদাইকে তাঁহারা অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এমন কি, খুদিরামের আগমন অপেক্ষা না করিয়া স্ত্রীলোক পাঠাইয়া কখন কখন গদাইকে আনাইতেন এবং বহুবিধ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। এক দিন এইরূপ ভোজনাদি করাইয়া কিছু গহনা পরাইয়া দেন। রামজয় খুদিরামকে বলিতেন, "সখা, তোমার পুত্রটি সামান্য নয়। ইহাকে আমার দেবতা বলিয়া জ্ঞান হয়।"

গ্রামের রমণীগণ দল বাঁধিয়া যখন দেবীদর্শনমানসে অল্পদূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতেন, তখন গদাইকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। একদিবস তাঁহারা ঐরূপে নিকটবর্ত্তী আনুড়গ্রামে বিশালাক্ষী দর্শনে যান্। লাহাদের গৃহিণী গঙ্গাবিষ্ণু লাহার মাতাও ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। গঙ্গাবিষ্ণুর মাতা গদাইকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "গদাই, তোমাকে এক এক বার দেবতা ব'লে মনে হয়। তোমাকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারিনি, কেন বল দেখি?" গদাই হাসিয়া বলিতেন, "তুমি আমাকে ভালবাস, তাই আমাকে দেবতা জ্ঞান হয়।" এই বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় খুদিরাম গদাইকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গদাই কিন্তু প্রত্যহ নিয়মমত পাঠশালায় যাইতেন না। সমবয়স্কদের লইয়া পূর্ব্বে যেরূপ কৃষ্ণলীলা, যাত্রা, গান, এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, পাঠশালায় নিযুক্ত হইয়াও সেইভাবে মধ্যে মধ্যে খেলা করিতেন। গুরুমহাশয় অন্যান্য বালকদিগকে যেমন পীড়ন করিয়া পাঠে মনোযোগ করাইতেন, গদাইয়ের অনুপস্থিতি-সময়ে তাঁহার জন্যও সেইরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন, মনে করিতেন; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত

এবং গুরুমহাশয়ের সম্মুখীন হইলে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেন। তিনি গদাইকে অতীব ভালবাসিতেন। লোকমুখে এবং তাঁহার অন্যান্য ছাত্রগণের নিকট গদাইয়ের যাত্রা, গান, কৃষ্ণলীলা এবং তাঁহার নিজের পড়াইবার নকল করার পটুতা শুনিয়া, একদিন গদাই বিদ্যালয়ে আসিলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাই, তুমি নাকি আমার পড়াবার বেশ নকল কত্তে পার?" গদাই কহিলেন, "পারি।" গুরুমহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা একবার কর দেখি।" অনুমতি-মাত্রে গদাই আপনাদের সঙ্গীদের যাহার যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া আপনি গুরুমহাশয়ের পালা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অন্যান্য ছাত্রগণ প্রথমে ভাবিয়াছিল, গদাই অন্তরালে গুরু-মহাশয়ের নকল করেন বটে, কিন্তু গুরুমহাশয়ের সমক্ষে পারিবেন না। কিন্তু গদাই অকুতোভয়ে নকল আরম্ভ করিয়া দিলে তাঁহার সঙ্গিগণ গুরুমহাশয়ের কোন ভাবান্তর না দেখিয়া গদাইয়ের ইঙ্গিতমত কার্য্য করিতে লাগিল। গুরুমহাশয় ও অপর বালকেরা এই অনুপম নকল দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। পরে গুরুমহাশয় বলিলেন, "গদাই, এই বারে একটা যাত্রা হোগ্।" তৎক্ষণাৎ গদাইচাঁদ সঙ্গি-গণকে লইয়া যাত্রা যুড়িয়া দিলেন। গুরুমহাশয় গদাইয়ের সুকণ্ঠ, বিশুদ্ধ ভাব ও বাণীমাধুর্য্যে বিমোহিত হইলেন। গুরুমহাশয় যত্ন করিয়াও গদাইকে হিসাব নিকাশ অঙ্ক শিখাইতে পারেন নাই; অঙ্কাদি কষিতে দিলে গদাই অনেক সময়ে দেবদেবীর নাম লিখিতেন। কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া কেন লেখাপড়ায় অলসের ন্যায় মন দেন না জিজ্ঞাসা করিলে গদাই বলিতেন, "বিদ্যা শিখে ত শ্রাদ্ধ করাতে হবে, আর চাল কলা বেঁধে আন্‌তে হবে। আমার অমন বিদ্যায় কাজ নেই। সেই অন্ন খেতে হবে।"

লাহারা গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপে সমারোহ করেন। একবার তাঁহাদের বাটীতে কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানাস্থানের টোল ও চতুষ্পাঠী হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করেন। পণ্ডিতগণ সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া তুমুল শাস্ত্রসংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। সেই সংগ্রাম-কোলাহলে বহুলোক আকৃষ্ট হইলে, গদাইও তাঁহার সমভিব্যাহারে বালকবৃন্দ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতগণ কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না দেখিয়া গদাই কোন প্রকারে সংগ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া সুমধুর কণ্ঠে সামান্য দুই একটী কথা ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশন অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে যেরূপ হয়, কঠিন শাস্ত্রীয় প্রশ্নের স্বল্পাক্ষরে সরল মীমাংসা শুনিয়া সেইরূপ পণ্ডিতগণ দ্বন্দ্বে নিরস্ত হইয়া গদাইয়ের শ্রীমুখপানে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। গদাইয়ের অপরূপ রূপলাবণ্য, সুমধুর হাস্য ও আলুলায়িত-কেশজাল-মধ্যগত স্নিগ্ধমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অনেকের মনে মানবপ্রকৃতিসিদ্ধ সারল্য পুনরুদয় হইলে, তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব বালককে আরও কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রকূটের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাইও সামান্য দুই চারিটি কথায় সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া আনন্দে কোল দান করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

গদাই এখন নয় দশ বৎসরের ছেলে, সর্ব্বদাই সমবয়স্ক বালকগণ সমভিব্যাহারে এখানে সেখানে নানারূপ ক্রীড়ায় নিযুক্ত। ক্রীড়াগুলি কিন্তু সাধারণ ছেলেদের মত নহে। মৃত্তিকা লইয়া কখন শিব, শিববাহন বৃষ, ত্রিশূল, শিঙ্গা ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া বিজয়া,

দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি গড়েন। ঐ সকল মূর্ত্তির গঠন এত নির্দ্দোষ এবং সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইত যে, অল্প দিনেই তাঁহার ঐ অদ্ভুত ক্ষমতার কথা গ্রামের সর্ব্বত্র রটিল এবং গ্রামে যাঁহার বাটীতেই পূজার জন্য প্রতিমা প্রস্তুত হইত, তিনিই গদাইকে গৃহে আনাইয়া প্রতিমা নির্দ্দোষ হইয়াছে কিনা, মত লইতে লাগিলেন। দোষযুক্ত হইলে অনেক সময়ে গদাই স্বহস্তে ঐ সকল প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া দিতেন।

খুদিরাম প্রতিদিন প্রত্যুষে স্নানান্তে সাজি হস্তে রঘুবীর এবং রামেশ্বর হইতে আনীত রামেশ্বর নামক বাণলিঙ্গের পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতেন। একদিন মালার উপযুক্ত অতি সুন্দর পুষ্প সকল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া রঘুবীরকে দিবার বাসনা হইলে, তিনি অতি যত্নে সেই ফুলের একটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া রঘুবীরের পূজায় বসিলেন। খুদিরাম অতি ভক্তিভাবে পূজা করিতেন এবং ধ্যান করিবার সময় নিস্পন্দ ও বাহ্যশূন্য হইয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। সেই দিন পূজায় বসিবামাত্র গভীর ধ্যাননিমগ্ন হইলেন; এদিকে গদাধর কোথা হইতে আসিয়া রঘুবীরের জন্য প্রস্তুত মালাটি আপন গলদেশে ধারণ, নৈবেদ্য ভক্ষণ, এবং রঘুবীর হস্তে গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন! তখনও খুদিরামের ধ্যান ভঙ্গ হইল না। অবশেষে গদাই পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, দেখ না, মালা প'রে কেমন সেজেছি দেখ না," এইরূপ বারম্বার বলিলে খুদিরাম চক্ষু চাহিয়া, গদাই ঐ ভাবে পূজার দ্রব্যজাত আত্মসাৎ করিয়াছেন দেখিয়াও কিছুই বলিলেন না। তখন তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? অপরে কিন্তু পদে পদে গদাইকে তিরস্কার করিতে ছাড়িত না।

উপনয়নের সময় উপস্থিত, বাটীর সকলে নানাবিধ আয়োজন করিতেছেন। ধনী কামারণী গদাইয়ের ভূমিষ্ঠ-কাল হইতে কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছে। তাহার নিতান্ত বাসনা—গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হয়, এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত ভাবিয়া একদিন গদাইকে অন্তরালে লইয়া আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে ভক্তবৎসল গদাই তৎক্ষণাৎ ধনীকে ভিক্ষামাতা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উপনয়নের দিন গদাই সকলকে জানাইলেন যে, তিনি ধনীকে ভিক্ষামাতা করিতে প্রতিশ্রুত, অতএব ধনী অগ্রে ভিক্ষা না দিলে অন্য কাহারও কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। সকলে শুনিয়া অবাক্। শূদ্রের দান বংশের কেহ কখন গ্রহণ করে নাই। আজ শূদ্রাণী ভিক্ষামাতা কি প্রকারে হইবে? রামকুমার ছোট ভাইটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি গদাইকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "শূদ্রের মেয়ে কি কারো ভিক্ষে মা হয়? বিশেষ, আমাদের বংশে কারো কখন হয় নি। ওরকম কথা বোল্‌তে নেই।" গদাই কোন কথাই শুনিলেন না, বলিলেন, "ঐ ধনীই আমার ভিক্ষে মা হবে।" ক্রমে খুদিরামের জমীদার প্রতিবেশী লাহা বাবুদের কাণে ঐ কথা উঠিল। তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে আসিয়া গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হইবার জন্য ধনীর কাতরতা এবং গদাইয়েরও ঐ বিষয়ে একান্ত জেদ দেখিয়া সকলকে বুঝাইলেন; তখন কাজেই সকলে গদাইয়ের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন এবং ধনীকে গদাইয়ের ভিক্ষামাতা হইতে সম্মতি দিলেন।

শ্রীনিবাস নামে একজন ভক্তিমান্ শাঁখারি একখানি সামান্য দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গদাইকে সে অত্যন্ত ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত এবং মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহাকে

স্বহস্তে ভোজন করাইত। এক দিবস সে আপনার মনে দোকানে বসিয়া এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে, এমন সময় গদাই আসিয়া উপস্থিত। চিনু সাদরে তাঁহাকে নিকট বসাইল। তাড়াতাড়ি মালা গাঁথিয়া ঐ মালা ও কিছু মিষ্টান্ন কাপড়ে ঢাকিয়া এক হস্তে লইল ও অপর হস্তে গদাইয়ের হস্ত ধারণ করিয়া মাঠের দিকে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া এক নিভৃত স্থানে একটি বৃক্ষমূলে গদাইকে দাঁড় করাইয়া প্রেমকম্পিতহস্তে তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিল; তৎপরে গদাইকে মিষ্টান্নগুলি একে একে খাওয়াইতে খাওয়াইতে দরবিগলিত-নয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "গদাই, আমি বুড় হয়েছি, বেশী দিন বাঁচ্‌ব না। তুমি এবারে যে কত লীলাখেলা কর্‌বে, তা দেখ্‌তেও পাব না। সে যাহা হোক্ গদাই, আমার তায় ক্ষোভ নেই; আমায় কৃপা কর, আমার জন্ম সার্থক হোক্।" কামারপুকুর ভ্রমণকালে তত্রত্য কয়েকজন প্রাচীন ব্যক্তির মুখে রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা শ্রীনিবাসের এইরূপে সর্ব্বাগ্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া চিনিতে পারার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "চিনুর বলরামের ভাব ছিল।"

খুদিরাম তাঁহার ভাগিনেয় রামচাঁদকে আপনার পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, তিনি সময়ে সময়ে ভাগিনেয়কে দেখিতে যাইতেন। গদাইয়ের একাদশ বৎসর বয়সের সময় খুদিরামের গ্রহণী রোগের সূত্রপাত হয়। কখন কোন রোগ ভোগ করেন নাই, এজন্য গ্রহণী রোগের প্রথম সূত্রপাতে তিনি ভীত হন নাই বা প্রতীকারের কোন চেষ্টা করেন নাই এবং সেই অবস্থাতেই একদিন সেলামপুরে রামচাঁদের বাড়ী উপস্থিত হয়েন। সেখানে রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; রামচাঁদ সাধ্যমত চিকিৎসাদি

করাইতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না। বিজয়া দশমীর দিবস খুদিরাম মুমূর্ষুপ্রায়, শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় রামচাঁদ আসিয়া তাঁহার আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া বলিলেন, "মাতুল মশাই, আপনি যে সদাই রঘুবীর রঘুবীর ব'লে থাকেন, এমন সময়ে চুপ ক'রে শুয়ে আছেন কেন?" খুদিরাম বলিলেন, "কেও? রামচাঁদ এলে?" রামচাঁদ বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" খুদিরাম "তবে দেখ, আমাকে বসিয়ে দেও" এই কথা বলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং তিনবার "রঘুবীর রঘুবীর রঘুবীর" বলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, রামচাঁদ ও তাঁহার ভগ্নী উভয়ে মাতুলের চরণে মস্তক রাখিয়া "আমার মাতুলের হৃদয়ে রাম ছিলেন, সেই রাম কোথায় গেলেন" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া মহাসমারোহে নদীকূলে খুদিরামের শবদেহের অগ্নিসংস্কার করা হইল। মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার ব্যতীত আর কোন সন্তান খুদিরামের নিকটে ছিলেন না।

গদাধর বাল্যাবস্থায় প্রায় সকল লোকের অন্দরে যাইতেন এবং মহিলাগণ যেখানে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, সেইখানে তাঁহাদের মধ্যস্থলে বসিয়া নানা গল্প, ঈশ্বরীয় কথা ও গান করিতেন। রমণীগণও তাঁহাকে গান গাহিয়া শুনাইতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তাঁহাদের কার্য্যকালে গদাই আসিলে মনে হইত, যেন কার্য্যের শ্রমলাঘব হইল। অদ্যাপিও সেই সকল রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, সে সময় কি আনন্দেই গিয়াছে, তাহা একমুখে বর্ণনা করা যায় না। এক দিন গদাইয়ের দর্শন না পাইলে সকলেই অতিশয় কাতর হইতেন। মনে হইত, "তার বুঝি বা অসুখ করেছে, তাই আসেনি;" এবং যতক্ষণ না কেহ যাইয়া তাঁহার

RARE BOOK Imp 4470 ...



সংবাদ লইয়া আসিত, ততক্ষণ তাঁহারা সুস্থির হইতে পারিতেন না। গদাইয়ের অদর্শনে তাঁহারা কেবল গদাইকেই চিন্তা করিতেন। গদাই মধ্যে মধ্যে স্বয়ং স্ত্রীবেশ পরিধানপূর্ব্বক তাঁহাদেরই হাব ভাব নকল করিয়া তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিতেন। তাঁহার সেই স্ত্রীবেশ, চাল চলন, কথাবার্ত্তা,হাবভাব অবিকল স্ত্রীলোকের মত হইত, এমন কি, পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকিলে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না।

রামকৃষ্ণের যখন তের চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন শ্রীনিবাস শাঁখারি, গয়াবিষ্ণু, ধর্ম্মদাস লাহা ইত্যাদি কয়েকজনে একটি যাত্রার দল করেন। সীতানাথ পাইনের বাটীতে একদিন সেই যাত্রা হইয়াছিল। উক্ত দিনে যাত্রারম্ভ হইবার পর দলের ভিতর যিনি শিব সাজিতেন, তাঁহার হঠাৎ শরীর অসুস্থ হওয়ায় যাত্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে গয়াবিষ্ণু রামকৃষ্ণকে শিব সাজাইবার ভার লইলেন। রামকৃষ্ণ গয়াবিষ্ণুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অর্দ্ধেক যাত্রা হইবার পর শিব সাজিয়া আসরে দেখা দিলেন। শিব-ভাবে গদাইয়ের ধীর গম্ভীর চলন, আরক্ত ঢুলু ঢুলু নয়ন ও যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য দৃষ্টি দেখিয়া সকলের ভ্রম জন্মিল—সকলে বলিতে লাগিল—"এ গদাই শিব সেজেছে, না, স্বয়ং শিব ভক্তগণকে নিজ লীলা দেখাইবার জন্য কৈলাস হইতে কামারপুকুরে আগমন করেছেন?" এদিকে রামকৃষ্ণ শিবভাবে বিভোর হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সুবঙ্কিম নয়নযুগলে প্রেমাশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে সেই অপরূপ ভাবসমাধি অবলোকন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, যাত্রা বন্ধ হইয়া গেল। সকলে দেখিল, তিনি যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানটী তাঁহার প্রেমাশ্রুধারায় ভিজিয়া গিয়াছে! কয়েকজন ভক্ত

এই সময়ে নৈবেদ্য-পুষ্প-বিল্বদল দিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিবজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। কিন্তু রামকৃষ্ণের কোনও ভাবান্তর হইল না, সেইরূপ সংজ্ঞাহীন, সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান, ও নয়নে অবিরল বারিধারা! কাজেই সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাটীতে বহিয়া লইয়া গেল এবং উক্ত বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া মস্তকে মুখে জলসিঞ্চনাদি করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। কথিত আছে, এইরূপে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইহার পর তিন দিন পর্য্যন্ত একটা নেশার ঝোঁকের মত ঝোঁক ছিল।

ধনী কামারণী লাহা বাবুদের বাটীর পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে থাকিত এবং সাহায্য করিবার বিশেষ কেহ না থাকায় আপন হস্তে পাক করিয়া খাইত। গদাই তাহার ভিক্ষামাতাকে এত ভালবাসিতেন যে, প্রায়ই তাহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া কথাবার্ত্তা আবদারাদি করিতেন এবং ধনী জাতিতে ছোট বলিয়া সহস্রবার নিষেধ করিলেও, আমরা শুনিয়াছি, তাহার রাঁধা ব্যঞ্জনাদি কখন কখন কাড়িয়া খাইয়া পলাইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিধবাদের মত ধনী খাদ্যসম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিত না, মাছ খাইত। তাহার জাতিস্থ অনেক বিধবা ওদেশে ঐরূপ করিয়া থাকে; তত্রত্য সমাজও তাহাতে কোন দোষ দেখে না। ধনী একদিন স্বীয় কুটীরে রন্ধনে নিযুক্তা; চিংড়ি মাছ দিয়া আলু দিয়া গরগরে করিয়া তরকারি নামাইল। উত্তম তরকারির সুগন্ধ নাসিকায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র, ধনীর চখে জল আসিল। সে ভাবিল, আহা! গদাই যদি তাহার স্বজাতি হইত, তাহা হইলে তাহাকে উহা খাওয়াইয়া কত আনন্দ ও তৃপ্তি হইত; গদাইয়ের এখন পৈতা হইয়াছে, এখন ও কথা মনে করাও দোষ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধনী ঘরের অন্যত্র অন্য কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াছে, এমন সময় দেখে, গদাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিংড়িমাছের তরকারি খাইতেছেন। তদ্দর্শনে ধনী আনন্দিতা হইলেও পাছে অপরে টের পায় এই ভয়ে "ও গদাই খেতে নাই, খাস্‌নি" ইত্যাদি বলিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণদেবও তৎশ্রবণে হাসিতে হাসিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ দীনহীন দরিদ্রগণকে লইয়া আরও দুই এক বৎসর নানা লীলাখেলা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় আসেন।

---

## কলিকাতায় আগমন।

পল্লিগ্রামে এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া পূজা-স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা সুপণ্ডিত রামকুমারের আর ভাল লাগিল না। তিনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ঝামাপুকুরে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন; আর সুবিখ্যাত সাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া আসিলেন। কারণ, নানাস্থান হইতে বিদায়ের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাইতেন। রামকুমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, সেই জন্য রামকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠ অভ্যাস করিতে বলিলে তিনি পূর্ব্বের মত উত্তর করিতেন, "প'ড়ে কি হবে? কেবল চাল কলা বেঁধে আন্‌বার সুবিধা হবে বৈ তো নয়। আমার অমন চাল কলা বাঁধা বিদ্যায় কাজ নেই।"

রামকুমার ক্রমে একজন গণ্য মান্য পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে

লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের বাটীতে সেই জন্য গতিবিধি আরম্ভ হইল।

রামকৃষ্ণ তখন মাত্র ষোড়শ বর্ষের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যাবধি তিনি অতি মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন, এবং কেহ গান করিতে অনুরোধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মনস্তুষ্টি করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, এবং যে একবার তাঁহার গান শুনিত, সে জীবনে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না; এবং তিনি যাহার সহিত একবার আলাপ করিতেন, সে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাঁহার ভ্রাতার টোলের নিকটস্থ অনেক গৃহস্থের বাটীতে এবং অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত যাইয়া তিনি ঈশ্বরীয় গান শুনাইতেন, আর তাঁহারা তাঁহার মধুর কণ্ঠ উথলিত ভগবৎভাব ও কিশোর মুখকান্তি প্রেমাশ্রুতে ভাসমান দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। কলিকাতা জানবাজার-নিবাসিনী মাহিষ্যবংশীয়া সুবিখ্যাতা রাণী রাসমণি কালী ও রাধাশ্যাম প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণেশ্বরে এক সুবৃহৎ মন্দির এই সময় নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। তিনি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন ষোড়শ উপচারে পূজা ও অন্নাদি-ভোগ দিবার বিধি লইবার মানসে দেশ দেশান্তর হইতে বহু অর্থব্যয়ে পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু রাণী উচ্চজাতীয়া নহেন বলিয়া পণ্ডিতগণ একবাক্যে অন্নভোগের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করায়, ভক্তিমতী রাণী মর্ম্মাহতা ও অপার-চিন্তামগ্না হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাণী পণ্ডিতগণের নিরুৎসাহজনক বাক্যে উদ্যমহীনা না হইয়া বরং মা কালীকে অন্নভোগ দিয়া নিত্যপূজা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন ও দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় নানা স্থানে লোক প্রেরণ করিলেন এবং সমাগত পণ্ডিতগণকে বিধিমত পুরস্কার দিয়া বিদায়

করিলেন। রাণীপ্রেরিত এক ব্যক্তি দশকর্ম্মান্বিত রামকুমারের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া রাণীর সঙ্কল্প তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবামাত্র রামকুমার রাণীর অপার ভক্তির প্রশংসা করিলেন ও কহিলেন, "এ জন্য আপনারা চিন্তিত কেন? রাণী তাঁহার গুরুদেবের নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলে অন্নভোগ দিবার আর কোনও বাধা থাকিতে পারে না।" সেই ব্যক্তি রামকুমারের এই আশ্বাসবাণী রাণীর কর্ণগোচর করিলে তিনি যেন পুনর্জীবিতা হইলেন এবং ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রার দিবস শ্যামা মায়ের প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করিলেন। দিন আগতপ্রায়, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই নিত্যপূজার কার্য্যে ব্রতী হইতে সম্মত হন না। রাণী জাতিতে কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তের অন্নে কেমন করিয়া মায়ের ভোগ দিবেন, এই তাঁহাদের সমস্যা; রামকুমারের বিধান তাঁহাদের মনঃপূত নহে। অগত্যা রাণী রাসমণি যে ব্যক্তি অন্নভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাকেই নিত্যপূজা-কার্য্যে ব্রতী হইতে লোক দ্বারা অনুরোধ করিলেন। রামকুমার চতুষ্পাঠীর অনিশ্চিত উপার্জ্জনের উপর নির্ভর অপেক্ষা রাসমণির অনুরোধ রক্ষা করিলে সংসার নির্ব্বাহের জন্য আর চিন্তিত হইতে হইবে না, অথচ কায়মনোবাক্যে শ্যামার পূজায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন, ভাবিয়া সম্মত হইলেন। রাসমণির আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন বহু সমারোহে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অসংখ্য দরিদ্র কাঙ্গালগণকে সুচারুরূপে ভোজন করান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বহু অর্থ দান করা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় মহা-[illegible] ভেদ করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শ্যামা মাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া একটী দোকান হইতে এক পয়সার

মুড়কি ও কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া জলযোগ করিয়া তথা হইতে ঠনঠনিয়ায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক চতুষ্পাঠীতে আহার করেন। চতুষ্পাঠীতে ছয় সাত দিন অবস্থানের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, রামকুমার কালীপূজায় ব্রতী।

রামকৃষ্ণদেব ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূজার কাজে কেন ব্রতী হলেন?"

রামকুমার উত্তর করিলেন, "এঁরা রাজার মত ধনী, ইঁহাদের আশ্রয়ে থাকলে কোন অভাব থাকবে না। মথুরও রাজার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী, আর আমাকে অত্যন্ত যত্ন ক'রে রেখেছেন, তাই এখানে শ্যামাপূজায় ব্রতী হয়েছি।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমাদের পিতা কখনও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নি, আপনি কি প্রকারে এখানে থাকলেন?"

রামকুমার ভ্রাতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভাই লৌকিক মতে নিন্দের কথা স্বীকার করি; কিন্তু আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিনি, তোমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ দেব।" এই বলিয়া ভ্রাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "রাসমণি নিজে যে জাতিই হউন না, এ দেবালয় কিন্তু তাঁহার গুরুদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মতঃ তাঁহার গুরুদেবেরই ইহাতে অধিকার এবং সেই জন্যই তিনি শূদ্রযাজী হন নাই বা ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্য করেন নাই। ভ্রাতার এই সকল কথা রামকৃষ্ণের মনঃপূত হইল না; কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহে বদ্ধ হইয়া তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু ভাগীরথী-কূলে নিজ হস্তে পাক করিয়া খাইতে লাগিলেন।

এক দিবস রাণী রাসমণির জামাতা প্রসিদ্ধ জমিদার মথুরানাথ

বিশ্বাস রামকৃষ্ণের অপরূপ তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রামকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মনোহর-মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিটি কে?"

রামকুমার উত্তর করিলেন, "ইনি আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর।"

মথুর কহিলেন, "ইনি এখানে থাক্‌লে অর্থাৎ পূজায় ব্রতী হইলে ভাল হয়।"

রামকুমার বলিলেন, "উনি এখানে থাক্‌তে সম্মত হবেন না।" কিন্তু মথুরের মন তাহা বুঝিল না; "কেন থাক্‌বেন না? সমুচিত যত্ন করলে কেন থাক্‌বেন না?" এই চিন্তা এবং সেই তেজঃপুঞ্জ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিল।

এই সময় রামকৃষ্ণের পিস্‌তুত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় চাকরী করিবার মানসে বর্দ্ধমানে আইসেন। তথায় শুনিলেন, তাঁহার প্রিয় মাতুলদ্বয় রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরস্থ দেবালয়ে আছেন। হৃদয় রামকৃষ্ণ অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ। তিনি রামকৃষ্ণকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। মাতুলদ্বয়কে দেখিবার জন্য এবং যদি রাসমণির আশ্রয়ে কোন প্রকার কর্ম্ম পাওয়া যায় এই আশয়ে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেবও প্রিয় সুহৃৎ ভাগিনেয়কে পাইয়া পরমাহ্লাদে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

রাণী রাসমণির দেবালয়ে রামকৃষ্ণের পূজায় ব্রতী হওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উক্ত হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন:—একদিবস মথুরানাথ কালীমন্দিরে পূজা করিতে যাইতেছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণদেবকে হৃদয়ের সঙ্গে একত্রে পদচারণ করিতে দেখিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামকুমারকে কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনার ভ্রাতাকে অনুগ্রহ ক'রে একবার

এখানে আস্‌তে অনুমতি করিবেন কি ?" এই কথা শুনিয়া রামকুমার ভ্রাতৃ-সন্নিধানে যাইলে মথুর মন্দিরমধ্যে পূজায় বসিলেন।

রামকুমার রামকৃষ্ণকে মথুরানাথের কথা বলিলেও তিনি তাঁহার নিকট যাইতে আপত্তি করিলেন। তদ্দর্শনে হৃদয় ছোট মাতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মামা, একটা রাজাবিশেষ মানুষ তোমায় ডাক্‌ছেন, অথচ তুমি যাচ্ছ না, একি ?" রামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "হৃদু, আমি ওর কাছে গেলে আমায় এখানে থাক্‌তে ( অর্থাৎ চাকরী স্বীকার করিতে ) বলিবে।"

হৃদয় কহিলেন, "তা এখানে থাক না কেন ? এখানে থাক্‌লে তো বেশ হয়।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "না, আমি চাক্‌রীতে আবদ্ধ থাক্‌বো না। তুই থাক্‌গে যা।"

হৃদয় কহিলেন, "মামা, তুমি যদি থাক ত থাকি।" এদিকে রামকুমার রামকৃষ্ণকে পুনরায় কহিলেন, "একজন মান্যমান্ লোক তোমায় ডাক্‌ছেন, তুমি আস্‌ছ না কেন ?" এই বলিয়া তিনি ভ্রাতার হস্ত ধারণপূর্ব্বক মথুরের নিকট কালীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মথুর জপ করিতেছিলেন, রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে পশ্চিম দিকে যাইয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি এখানেই থাক।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "এ সমস্ত কাজে বড় হাঙ্গাম, ঠাকুরের গহনা জিনিষ পত্র হেঁপাজত্ করা বড় কঠিন।" মথুরানাথ তথাপি বারবার অনুরোধ করায় রামকৃষ্ণ অগত্যা হৃদয়কে দেখাইয়া কহিলেন, "যদি আমার ভাগ্নে হৃদয়কে রাখেন, তা হ'লে আমি থাক্‌তে পারি।" ইতিমধ্যে রামকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কথাবার্ত্তা হ'ল ?"

মথুরানাথ উত্তর করিলেন, "এই হচ্ছে;" তৎপরে রামকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "তা বেশ কথা, আপনাদের ভাগ্নে শ্যামার বেশকারী হ'ন। তুমি বাবা এইখানেই থাক।" মথুর পুনরায় রামকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর হৃদয়ঠাকুর আপনাদের দুই ভাইয়ের আর সমস্ত জিনিষ পত্রের হেঁপাজৎ করবেন।" মথুর তৎপরে দাওয়ানকে ডাকাইয়া নূতন বন্দোবস্তের সমস্ত আজ্ঞা দিলেন। তদবধি রামকৃষ্ণ বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহদ্বয়ের বেশ-ভূষা ও পূজাদি করিতেন এবং হৃদয় মা কালীর বেশ করিতেন ও মন্দিরদ্বয়ের জিনিস পত্র হেঁপাজৎ করিতেন।

গঙ্গার পূর্ব্বকূলে কলিকাতার প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে রাণী রাসমণির বিখ্যাত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। উচ্চ-চূড়াবিশিষ্ট কালী-মন্দিরের উত্তরে বিষ্ণুমন্দির, তাহাতে রাধাশ্যাম-মূর্ত্তি। এই মন্দির-দ্বয়ের পশ্চিমে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, পূর্ব্বে দেবসেবার জন্য রন্ধনশালা ও পুষ্করিণী, প্রাঙ্গণের পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির, তাহাদের মধ্যস্থলে বৃহৎ চন্দ্রাতপ ও তৎসংলগ্ন বাঁধা ঘাট; এই ঘাটের উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান। দেবালয়ের দক্ষিণে এক সারি প্রকোষ্ঠ, দেবালয়ের কর্ম্মচারিগণের আবাস; এবং উত্তরে বারাণ্ডা, কাঙ্গালীদিগের খাইবার স্থান, মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকিবার একটি প্রশস্ত দেউড়ি, একটি সুবৃহৎ বারাণ্ডা মধ্যে দেয়াল থাকায়, উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত এবং সর্ব্বশেষে গঙ্গার ধারে একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। এই পশ্চিমোত্তর কোণের প্রকোষ্ঠে রামকৃষ্ণদেব বাস করিতেন। ইহার উত্তরে সুপ্রশস্ত উদ্যান, তন্মধ্যে একটি সুসজ্জিত অট্টালিকা। রাণী ও তাঁহার সংসারভুক্ত ব্যক্তিগণ দেবালয়ে আসিলে ঐ অট্টালিকায় বাস করিতেন। স্রোতস্বতী ভাগীরথীর তীরে বিস্তীর্ণ উদ্যান-মধ্যগত

দেবালয় ভক্তের মানসকল্পিত শিল্পসৌন্দর্য্যের একটি আদর্শ। ভারতের বহু স্থান পর্য্যটনেও এতাদৃশ সুন্দর ছবি আর নয়নগোচর করেন নাই বলিয়া অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

হৃদয় আসিবার অল্পকাল পরে জন্মাষ্টমীর দিবস বিষ্ণুমন্দিরের পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্নান করাইবার জন্য বিগ্রহটি বাহিরে আনিবার সময় অনবধানতাবশতঃ ফেলিয়া দিয়া উঁহার একটী পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ক্ষেত্রনাথ সেই অপরাধে রাণীর দেবালয় হইতে বিতাড়িত হন। ভগ্ন বিগ্রহের পূজা হইতে পারে কি না, এই ভাবিয়া রাণী অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিলেন, "বিগ্রহ ভগ্ন হইলে তাহাতে আর পূজা চলে না, শাস্ত্রনিষিদ্ধ।" তাঁহারা ভাস্কর আনাইয়া নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করাইতে অনুমতি দিলেন; রাণীও তাহাই করিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তুমি এক দিন পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনাও, আর জিজ্ঞাসা কর—যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর বা পুত্রের প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে কি সে স্ত্রীলোক স্বামী বা পুত্রকে ত্যাগ কর্‌বে?"

রাণী রামকৃষ্ণদেবের এই অপূর্ব্ব যুক্তিসিদ্ধ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অচিরে একটি পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান করাইয়া তাহাদিগকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ মহা সমস্যায় পড়িলেন, সব শাস্ত্র-বিচার ঘুরিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া পরে কহিলেন যে, ঐরূপ অবস্থাপন্ন স্বামী বা পুত্রকে ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থাই বিধি।" রাসমণি তখন কহিলেন, "তবে এক্ষেত্রে ঠাকুরের বিগ্রহ ত্যাগ করা উচিত না চিকিৎসা করান উচিত?" অগত্যা তাঁহারা কহিলেন, "বিগ্রহ ত্যাগ

না করিয়া উপযুক্ত লোকদ্বারা চিকিৎসা করান উচিত।” এই কথা বলিয়া পণ্ডিতগণ প্রস্থান করিলে পর রাণী রামকৃষ্ণদেবের নিকট কর-যোড়ে বলিলেন, “তবে বাবা, তুমি অনুগ্রহ ক’রে বিগ্রহের চিকিৎসা করবে কি?” রামকৃষ্ণ সেই বিগ্রহের ভগ্ন পদটী এমন পুনর্যোজনা করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেও যোজিত স্থানটী কাহারও লক্ষিত হয় না এবং অদ্যাপিও সেই বিগ্রহ সেই ভাবেই আছেন।

পরে ভাস্কর যখন নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া আনিল, মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে সেইটী দেখাইয়া কহিলেন, “মশাই এই নতুন মূর্ত্তিটা কি সেই মূর্ত্তির মত হয়েছে?” রামকৃষ্ণ দুইটি মূর্ত্তি একত্র করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীরাধার ভাব হইল, এবং সেই ভাবাবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ঠিক হয় নি;” মথুরানাথ এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন, মূর্ত্তি ঠিক হয় নাই, কিন্তু ভাস্করকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন এবং সেই নূতন মূর্ত্তিটি সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন। রাধাকান্তজীউর পূজক ক্ষেত্রকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, এক্ষণে এক জন পূজকের আবশ্যক। মথুরানাথ রামকুমারকে কহিলেন, “ভট্টচার্য্য মশাই, আপনার ভাই যদি রাধাকান্তের পূজায় ব্রতী হন ত বড় ভাল হয়। আপনি উঁহাকে ব’লে রাজী করাবেন কি?” রামকুমারের অনুরোধে রামকৃষ্ণ সম্মত হইলেন।

রাধাকান্তজীউর পূজায় ব্রতী হইয়া রামকৃষ্ণ পূজান্তে স্বহস্তে শিব গঠন করিয়া পূজা করিতেন। এক দিবস নিবিষ্ট চিত্তে শিবপূজা করিতেছেন, নিকটে হৃদয় উপবিষ্ট, এমন সময়ে মথুরানাথ আসিয়া তথায় উপস্থিত। মৃত্তিকার শিব ত্রিশূল ডমরু ও বৃষটির অনুপম গঠন

দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শিব কে গড়েছেন, ?" হৃদয় উত্তর করিলেন, "মাতুল স্বয়ং গড়েছেন।" মথুর ইহাতে আরও বিস্মিত হইয়া পূজার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজান্তে অতি যত্ন সহকারে সেই সমস্ত মূর্ত্তি-গুলি রাণীর নিকট উপস্থিত করিলেন এবং রামকৃষ্ণের বহুল প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "যদি ইঁহাকে শ্যামা পূজায় ব্রতী করতে পারা যায় ত ইনি অতি শীঘ্রই মাকে জাগ্রত করতে পার্‌বেন।" দুইজনে এই পরামর্শ করিয়া মথুরানাথ রামকৃষ্ণ-সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমায় অনুগ্রহ ক'রে শ্যামাপূজার ভার নিতে হবে।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নি, শাস্ত্রমত পূজা কেমন ক'রে কর্‌বো ?"

এই কথা শুনিয়া মথুর কহিলেন, "বাবা, তোমার যে ভক্তি, সেই ভক্তিতেই মাকে বেঁধে ফেল্‌বে। তোমার পূজায় মন্ত্র তন্ত্রের দরকার নেই। তুমি ভক্তিভাবে যা ব'লে পূজা কর্‌বে, মা তাই সন্তুষ্ট হ'য়ে গ্রহণ কর্‌বেন।" মথুরের এই অপার বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া রামকৃষ্ণ জগন্মাতার পূজায় ব্রতী হইলেন, আর রামকুমার বিষ্ণুপূজার ভার গ্রহণ করিলেন। হৃদয় তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ মাতুলের সহকারীর কার্য্য করিতেন। তিনি মা কালীকে মনের সাধে সাজাইয়া দিতেন, আর রামকৃষ্ণদেব সুরাপানোন্মত্ত ব্যক্তির মত মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বজননীর পূজা করিতেন। তিনি ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাসাদি করিবার সময় সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতেন। 'রং ইতি জলধারয়া অগ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য' এই সকল যেমন উচ্চারণ করিতেন, অমনি সেই প্রকার অর্থাৎ অগ্নির বেড়া ইত্যাদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন, আর তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়িত। এই সময়ে যিনি তাঁহার পূজা

ও সুন্দর আরাত্রিক অবলোকন করিতেন, তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন, স্বতঃই তাঁহার মনে হইত যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবই শ্যামার পূজা করিতেছেন. এবং তিনি বহু শুভাদৃষ্ট বশতঃ সেই অলৌকিক ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন করিতে পাইতেছেন।

ভাবসমাধির উচ্চস্তরে উঠিয়া মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যতদিন না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাহ্য পূজা করিতে একেবারে অপারক হইয়া পড়েন, ততদিন এইরূপে জগদম্বার পূজা করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ই উক্ত পূজায় ব্রতী হন। এতৎ সম্বন্ধে হৃদয়ের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম।

একদিন রামকৃষ্ণদেব ঐরূপে আলুথালুভাবে পূজা করিতেছেন, এমন সময় মথুরানাথ বিশ্বমাতার সেই মনোহর পূজা দেখিবার জন্য মন্দিরমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূজা করিতে করিতে হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া হৃদয়ের হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক পূজকের আসনে বসাইয়া মথুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি পূজা করিলেও যা হবে, হৃদু পূজা কর্‌লেও তাই হবে।" মথুরানাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া পরে হৃদয়কে অন্তরালে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। যাহা হোগ্ তুমি একজন পণ্ডিতের কাছে পূজার পদ্ধতিগুলি প'ড়ে নিও।" হৃদয়ও তাহাই করিলেন। পূজার সময় হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিকটে থাকিলে তাঁহাকে আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া অর্ঘ্য পুষ্প চন্দনাদি দিয়া রামকৃষ্ণ ও মা কালীকে একজ্ঞানে পূজা করিতেন।

রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্যামামূর্ত্তি দেখিতে দিগ্‌দেশান্তরের ইতর ভদ্র, যুবা বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তাহাদের যাহার যেমন সংস্থান, সেই মত প্রণামী দিয়া শ্যামা দর্শনে

আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া যাইত। রাসমণির দেবালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে উক্ত প্রণামী পূজারীর প্রাপ্য হইত—কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সেই সমস্ত প্রচুর অর্থ স্পর্শও করিতেন না; হৃদয়কে দিয়া তাহা কাঙ্গাল-দরিদ্রগণকে বিতরণ করাইতেন।*

শ্যামার পূজা করিয়া তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া রামপ্রসাদের শ্যামা-বিষয়ক গান গাহিয়া মাকে শুনাইতেন। আর আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। কখন বা ক্রমাগত কাঁদিতেন, আর বলিতেন, "মা, তুই আমায় দেখা দে মা; তুই শুন্‌চিস্ নি মা? তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবি নি মা?" কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার মনের বেগ এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিতেন; ধ্যান করিতে বসিয়া স্থাণুবৎ স্থির ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন এবং সেই অবস্থায় তিন চারি ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। ক্রমেই ভাবাবেশের প্রগাঢ়তা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। জগজ্জননীর পূজার প্রারম্ভে আত্মপূজা করিতে গিয়া আপন মস্তকে একটি ফুল দিয়াই বিহ্বলচিত্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইতেন। কখন বা আরাত্রিক করিতে করিতে অবিরাম আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল সিক্ত, নয়নদ্বয় ও মুখমণ্ডল রক্তাভ, মাতালের মত সর্ব্বাঙ্গ টলমল, বাহ্য চৈতন্য যেন নাই,—কতক্ষণ আরতি করিতেছেন কিছু মাত্র হুঁস নাই—অথচ বাম হস্তের ঘণ্টা ও দক্ষিণ হস্তের আরতি-প্রদীপ সমভাবেই চলিতেছে; ক্রমে এইরূপে এক ঘণ্টা অতীত, তথাপি বিরাম নাই—সঙ্গে যাহারা ঘড়ি কাঁসর ইত্যাদি বাজাইতেছিল, তাহারা অবসন্নপ্রায়—আরও এক ঘণ্টা অতীত হইলে, তাহারা

* হৃদয় এ কথা বলিয়াছেন।

নিরস্ত হইল—কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সমভাবেই আরতি করিতেছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে বদনে 'মা মা' রব!

এই সময়ে তিনি আপনার ভিতরে ও বাহিরে সমস্তাবে মা কালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতেন। কখন মা কালীর চরণে জবাবিল্বাদি দিয়া পূজা করিতেন। আবার কখন তাঁহার হস্ত একটি অর্ঘ্য লইয়া আপনাপনি মা কালীর পাদপদ্মে না দিয়া প্রথমে আপনার মস্তকে ও বক্ষে স্পর্শ করাইয়া পরে মা কালীর পাদপদ্মে দিত। তিনি বলিতেন, অর্ঘ্য মার পাদপদ্মে দিতে গিয়া হস্ত আপনি বাঁকিয়া আসিয়া আপন অঙ্গে পড়িত, কখন সিংহাসনের উপর এক পদ রাখিয়া মা কালীর চিবুক ধরিয়া আদর করিতেন, গান করিতেন, হাসিতেন, আবার কখন বিশ্বজননীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অনুপম নৃত্য করিতেন। কখন ভোগের অন্ন শ্যামাকে নিবেদন করিতে করিতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও কিঞ্চিৎ অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া মা কালীর মুখে দিলেন, তাহার পর কহিলেন, "কি বল্লি? আমি খাব?—আচ্ছা আমি খাচ্চি", এই বলিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, আবার মার মুখে দিলেন। কখন বা ভোগ দিতেছেন এমন সময় একটা বিড়াল, 'ম্যাও' 'ম্যাও' করিতেছে দেখিয়া, "মা খাবি? মা খাবি", বলিয়া তাহাকে ভোগের কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেন, পরে শ্যামার পর্য্যঙ্কে মাকে মানসে শয়ান করাইতেন। আবার কখন বা আপনি তাহাতে শয়ন করিতেন।

এই সময় তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাসনা হইলে, কলিকাতা বৈঠকখানা-নিবাসী তান্ত্রিক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্র লইবার দিন স্থির করিলেন। কেনারাম মন্দিরমধ্যে শ্যামার সমক্ষে রামকৃষ্ণদেবের কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি হুঙ্কার দিয়া ভাবস্থ হইলেন।

একথা হৃদয়ের মুখে জ্ঞাত হইয়াছি।

রামকৃষ্ণদেব ভাবোন্মত্ত হইয়া সাধারণের সমক্ষে এই সকল নিয়ম-বহির্ভূত কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া, দেবালয়ের খাজাঞ্চী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল, "ভট্‌চার্জ্জি মশাই পাগল হ'য়ে সব নষ্ট কল্লে। ঠাকুরের পূজা ভোগ ত কিছুই হচ্চে না। তার ওপর সমস্ত অনাচার, পাগলে যা করে তাই হচ্ছে। এ সব কথা মথুর বাবুকে জানাতে হবে।" তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া মথুরানাথকে জানাইল। তিনি এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া গুপ্তভাবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে, ইঁহার মা কালীর সাক্ষাৎকার হইয়াছে, ইঁহার পূজাই ঠিক্ পূজা এবং ইঁহার পূজাই মা কালী গ্রহণ করিতেছেন. এই নির্ণয় করিয়া তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। দেবালয়ের কর্ম্মচারিগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, মথুর আসিয়া, ভট্টাচার্য্যকে দূর করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া মথুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে দেখিয়া এবং, "এত দিনের পর মা কালীর প্রতিষ্ঠা সার্থক হল, আর পূজাও এত দিনে সার্থক হল" বলিতে শ্রবণ করিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইল। রামকৃষ্ণদেব তখন ভাবে বিভোর, অঙ্গ টলমল. চৈতন্য-রহিত। মথুরও ইহা দেখিয়া ভাবতরঙ্গোত্থিত হৃদয়ে জানবাজারে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তথা হইতে পত্র দ্বারা দেবালয়ের কর্ম্মচারিবর্গকে আজ্ঞা করিলেন যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। কর্ম্মচারীরা এই পত্র পাইয়া আরও আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তদবধি তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আর কোনও প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিত না।

এই সময়ে রামকুমার এক বৎসরকাল রাণী রাসমণির দেবালয়ে বাস করিয়া কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইবার মানসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেবালয়ের অন্ন আহারে আপত্তি করায় মথুরানাথ তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার ভাই রামকৃষ্ণ, আপনার ভাগ্‌নে হৃদয় তাঁরা কেমন কোরে এই অন্ন আহার কর্‌ছেন, আর তাঁরা যখন সেই অন্ন ভোজন কর্‌ছেন, তখন আপ্‌নার আপত্তি কি?"

রাম-তারক (ওরফে হলধারী) কহিলেন, "মশাই, আমার ভাই-য়ের একটা অবস্থা হয়েছে, তার কিছুতেই কোন দোষ হয় না দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার ত সে অবস্থা হয় নি, আমি কেমন ক'রে খাব? আমার খেলে দোষ হবে।" মথুর এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে হলধারীর জন্য সিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হলধারী সেই সিধা লইয়া পঞ্চবটীর নিকটে একটী ভগ্ন কুটীরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন।*

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবোন্মত্তাবস্থায় তিন চারি বৎসর অতি-বাহিত করিলে পর তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে এক সময় তিনি তাঁহার ভাগিনেয় হৃদ-য়ের বসত-বাটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, একজন অতিথি খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল; এবং পল্লি-নিকটস্থ অনেকেই সেই গান শুনিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আপনার তিন বৎসরের দৌহিত্রীকে ক্রোড়ে করিয়া তথায় গান শুনিতে উপস্থিত হইলে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ সেই বালিকাকে বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, "তুই মা, এত লোকের

* এই কথা হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত।

মধ্যে কাকে বে করবি বলত ?" বালিকা অমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। হৃদয় পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলে যে, এই ঘটনার দুই বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মীয়গণ সেই বালিকার জন্মপত্রিকা দেখিয়া তাঁহার সহিত বিবাহের স্থির করেন। রামকৃষ্ণদেব বিবাহের দিন অতিপ্রফুল্ল চিত্তে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন এবং বাসরঘরে শ্যামাবিষয়ক গান শুনাইয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

কামারপুকুরে অবস্থিতিকালে তিনি বাটীর নিকটবর্ত্তী ভূতির খালের শ্মশানে সর্ব্বদাই যাইতেন, কোন কোন দিন তথায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত একাকী থাকিতেন। বহু পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে সেই শ্মশানে একটী বেলগাছ বসাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে তুলসীর বেড়া দিয়াছিলেন। এই সময় সেইস্থানে তিনি গোপনে সাধনা করিতেন। শুনিয়াছি, এই বেলগাছটী অদ্যাপি বর্ত্তমান।

বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহার ভগবদ্বিরহ এতই প্রবল হইয়া উঠিত যে, "মা দেখা দে" বলিয়া কাতর ক্রন্দন করিতেন ও ভূমিতে মুখ ঘসিতেন। কখন কখন বদন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িত। কখন বা আপন মনে ভাগীরথীর তীরে পাগলের মত বসিয়া থাকিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে, "মা, আমায় দেখা দে মা! আমি মান চাইনি, ঐশ্বর্য্য চাইনি, আমি কিছুই চাইনি, মা! তুই কেবল আমায় দেখা দে মা", বলিয়া হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন করিতেন। নিকটস্থ সকল লোক তাঁহার এই ভাব বুঝিতে না পারিয়া "ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাগল হয়েছেন" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

# সাধনাবস্থা।

রাসমণির দেবালয়ের উদ্যানে এখন যে স্থানে পঞ্চবটী আছে, রামকৃষ্ণদেব যখন পূজায় ব্রতী হয়েন, তখন সেই স্থানে ঐ পঞ্চবটী ভিন্ন একটী আমলকী বৃক্ষও ছিল, এবং একটী খাদ ও চতুর্দ্দিকে জঙ্গল ছিল। কেহ সেইজন্য ঐ স্থানে যাইত না। রামকৃষ্ণদেব সেই আমলকী বৃক্ষের তলায় নীচু স্থানটীতে বসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ধ্যান করিতেন; হৃদয় ইহা জানিত না। সে রামকৃষ্ণদেবকে সন্ধ্যার পর দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইত না। একদিন সে রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, তুমি রোজ সন্ধ্যার পর কোথায় যাও?"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "ঐখানে একটা আমলকী গাছ আছে, তার তলায় ব'সে ধ্যান করি। সেখানে বস্‌লে আপ্‌নি ধ্যান হয়। আমার বোধ হয়, সেখানে যে যা মনে কোরে ধ্যান করে, তার তা সিদ্ধ হয়।"

এই কথা শুনিয়া হৃদয় একদিন সন্ধ্যার পর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, রামকৃষ্ণদেব উলঙ্গ হইয়া সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় ধ্যান করিতেছেন। হৃদয় এই দেখিয়া কহিতে লাগিল, "কি হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে ন্যাংটা হ'য়ে বসেছ যে?"

ধ্যানভঙ্গ হইলে রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "তুই জানিস্ নি? ঐ রকম করে বালকের মত হয়ে জগদম্বার ধ্যান কর্‌তে হয়। আমি এখনি আবার সব পর্‌চি।" হৃদয়ের মনে হইল, এ সকল পাগলের কার্য্য,—তাঁহার মাতুল কেন এরূপ আচরণ করিতেছেন? এই ভাবিয়া রামকৃষ্ণদেবকে ঐ প্রকার কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য নানা

প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিল এবং রামকৃষ্ণদেবের ধ্যান করিবার সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য দূর হইতে তাঁহার গাত্রে ঢিলি নিক্ষেপ ও নানাপ্রকার উৎপাত করিতে লাগিল। একদিন রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে বলিলেন, "তুই অমন করিস্ কেন?" হৃদয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রতিদিন ঐরূপ করিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণও আর তাহাকে কিছু না বলিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহার ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। বড়লোকের কার্য্যকলাপে একটা সংক্রামক গুণ থাকে; কয়েক দিন ঐরূপ করার পর হৃদয়েরও একদিন ঐ স্থানে বসিয়া ঐরূপ ভাবে ধ্যান করিবার ইচ্ছা হইল। সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐ বিষয় কিছু না জানাইয়া একদিন রাত্রে একাকী তথায় যাইয়া ঐরূপ ভাবে ঐ বৃক্ষতলে ধ্যান করিতে বসিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে হৃদয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মামা পুড়ে মলুম গো, পুড়ে মলুম গো, আমার গায় কে তিন ঝুড়ি আগুন ঢেলে দিলে, জ্ব'লে মলুম মামা, রক্ষা কর মামা, মলুম।" রামকৃষ্ণদেব হৃদয়ের চীৎকারে তথায় উপস্থিত হইয়া "কি হয়েছে রে?" বলিয়া হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া দিলেন; সে হস্তস্পর্শে হৃদয়ের ঐ জ্বালা-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূর হইল এবং হৃদয় শান্ত হইল। হৃদয় শান্ত, হইলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যা, তোর অবিদ্যাপাশ পুড়ে গেল আর তুই আমার সঙ্গে ওরূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করিস্ নি, এখন ক্রমে সব বুঝ্‌তে পার্‌বি।" তদবধি হৃদয় আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিত না; বরং রামকৃষ্ণদেব যখন যাহা করিতেন, তাহার ভাব অল্প অল্প বুঝিতে পারিত, এবং প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করিত।*

---

* হৃদয় আমাদের নিকট এ ঘটনাটির পূর্ব্বোক্তরূপ উল্লেখ করিয়াছিল।

রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে নিয়মমত মা কালীর পূজা করিতে পারিতেন না। হৃদয়ই নিয়মমত পূজা করিত, এবং রামকৃষ্ণদেব যখনই ইচ্ছা হইত, মধ্যে মধ্যে পূজা করিতেন এবং পূজান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেন, আর আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। একদিন তিনি শ্যামার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে ঐরূপ গান করিতেছেন, এমন সময় রাণী রাসমণি তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ গান বন্ধ করিয়া রাণীর পৃষ্ঠদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ! এখানেও মোকদ্দমা?" রাণীর মন প্রকৃতই ভগবৎ-বিষয়ে নিবিষ্ট ছিল না, তিনি একটী মোকদ্দমার চিন্তাই করিতেছিলেন। "রামকৃষ্ণ মনোভাব জানিতে পারেন!" ইহা দেখিয়া রাণী চমৎকৃত হইলেন! আবার ভাবিলেন "রামকৃষ্ণ আমার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছেন? নইলে আমি মোকদ্দমা ভাবছিলুম কেমন করে জান্‌তে পারলেন? ইনি সাধারণ লোক নন,"—এই প্রকার চিন্তা করিয়া, এই ঘটনার পর হইতে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। নিকটে তাঁহার যে সকল দাসদাসী উপস্থিত ছিল, তাহারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্পর্দ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং রাণী নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বলিতে লাগিল, "মা, ভট্‌চাযি্য মশাই বড়ই অন্যায় ব্যবহার করেছেন।"

রাণী রাসমণি উত্তর করিলেন, "নারে, তোরা জানিস্ নি, আজ মা কালী স্বয়ং আমাকে চড় মেরে জ্ঞান দিলেন, আজ আমার জ্ঞান হ'ল, তোরা যা, এই সরবৎ আর জলখাবার ভট্‌চাযি্য মশাইকে দিয়ে আয়।" এই বলিয়া স্বহস্তে মিছরির ও বেদানার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া রামকৃষ্ণের সেবার্থে পাঠাইলেন। এই অবধি রাণী প্রায়ই আসিয়া

নিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার গান শুনিতেন। 'কোন্ হিসাবে হর-হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে,' এই গানটী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

হৃদয় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শ্যামার আরতি করিতেন। প্রায়ই রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়া আরতি দেখিতেন। এক দিবস সন্ধ্যার ঈষৎ পূর্ব্বে হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, "মামা চল, আরতি দেখ্‌বে চল।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যা তুই যা না, আমি যাব না!" হৃদয় পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, আপনার ঘরে বসিয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ও গাঢ় অন্ধকার হইয়া আসিল। মন্দিরমধ্যে হৃদয় এক মনে ঘোররূপিণী শ্যামার আরাত্রিক করিতেছেন, এমন সময় মেদিনী কাঁপাইয়া ঘোর মেঘনাদে মন্দিরস্থ একটী চূড়ার উপর বজ্রাঘাত ও সেই শব্দে মন্দিরস্থিত একজন ভৃত্য মূর্চ্ছিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময় হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে বজ্রপাতের কথা জানাইলে তিনি কালীমন্দিরের দিকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমি কি করব? সব মার খেলা," এই বলিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছিত ভৃত্যের মস্তকে পাঁচ সাত কলসী জল দিবার পর সে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ও সুস্থ হইল।

এই ঘটনার কিছু পরে, একদিন রামকৃষ্ণদেব যেখানে সন্ধ্যার পর যাইয়া ধ্যান করিতেন, সেই স্থানটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "দেখ্ ঐ খানে পঞ্চবটী কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, কি করি বল্ দেখি?" হৃদয় কহিলেন, "এ ত সামান্য কথা, এর জন্যে ভাবনা কি?" এই স্থানের নিকটেই একটা ক্ষুদ্র ডোবা ছিল, সকলে তাহাকে হাঁস-পুকুর বলিত। এই কথার প্রায় একমাস পরে ঐ পুষ্করিণী ভাল করিয়া কাটান হয়। হৃদয় সেই মাটি দ্বারা খাদটী পূর্ণ করাইলেন,

জঙ্গল পরিষ্কার করাইলেন এবং সেই স্থানে অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকীর চারা লাগাইয়া পঞ্চবটী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব স্বহস্তে কেবলমাত্র অশ্বত্থ বৃক্ষটী রোপণ করিয়াছিলেন। পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে গোলাকার করিয়া তুলসীর বেড়া লাগাইতে অনুমতি করিলেন, হৃদয় তাহাও করিয়া দিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থলে একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ভর্ত্তাভারী নামক দেবালয়ের মালীকে দিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের কেয়ারী করা হইল। সেই বৃক্ষগুলি অল্প দিনের মধ্যে সতেজ হইয়া উঠিল এবং তুলসীগুলি এত বড় হইয়া উঠিল যে, রামকৃষ্ণদেব তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিতেন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। এইরূপে প্রত্যহ তথায় বসিয়া সন্ধ্যার পর ধ্যান করিতেন।

পঞ্চবটী প্রস্তুত করাইবার পূর্ব্বে তিনি বৃন্দাবন হইতে রজ. রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের মাটী, ছাপ ইত্যাদি আনাইয়াছিলেন। পঞ্চবটী প্রস্তুত হইলে হৃদয়কে দিয়া সেই সমস্ত রজ ও মাটী তথায় ছড়াইলেন এবং তাহার কিয়দংশ আপনার ঘরের একস্থানে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, “আজ থেকে এই স্থান বৃন্দাবন হ'ল।” ইহার পর মথুরকে কহিলেন, “মথুর, একটী মহোৎসব কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।” মথুরানাথকে আর অধিক কিছুই বলিতে হইল না, তিনি সম্মত হইলেন। একদিন কুড়ি পঁচিশ দল কীর্ত্তন, তাঁহাদের জানিত যত গোস্বামিগণ ও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিলেন। প্রায় দুই তিন সহস্র লোক একত্র হইয়া পঞ্চবটীর তলে মহা আনন্দ ও কীর্ত্তন করা হইল। তৎপরে ভোজনের কিছু পূর্ব্বে কথায় কথায় কয়েকজন গোস্বামী বৈষ্ণবদের কটূক্তি করাতে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব অমনি মথুরকে

কহিলেন, "মথুর, তুমি বৈষ্ণবদের বল, 'আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছি, গোঁসাইদের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তোমাদের বিদায় দেব, তোমরা এস।" মথুর এই কথা তাঁহাদের কহিলে তবে তাঁহারা পুনরায় আসিয়া ভোজনাদি করিলেন ও বিদায় লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব সাধনার এই উন্মত্তাবস্থায় মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাইয়া কিছুদিন ধরিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেন। এই সময়ে গ্রামস্থ জনসাধারণে তাঁহার অসাধারণ ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্থির করিলেন ইনি বায়ুরোগগ্রস্ত, আবার কেহ বা মনে করিলেন, হয়ত ইঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। চন্দ্রাদেবী নানালোকের নানাকথায় এবং পুত্রেরও ভাববৈলক্ষণ্য দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ ওঝাকে ডাকাইলেন। কথিত আছে, ওঝা চণ্ড নামাইলে পর ভূত রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "একে ত ভূতে পায়নি। ও রামকৃষ্ণ, তুমি যে সাধু হবে, তবে এত সুপুরি খাও কেন?" এই সময় তিনি সত্যই সুপারি কিছু অধিক খাইতেন। গ্রামবাসিগণ ভূতের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করিলেন যে, তাঁহাকে ভূতে পায় নাই বটে, কিন্তু পাগল হইয়াছেন। এই সকল লোকের কথায় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত ভীতা হইয়া গ্রামস্থ একটী শিবালয়ে যাইয়া 'হত্যা' দিলেন; এবং স্বপ্নে দেখিলেন, মহাদেব বলিতেছেন, "তোমার ছেলে রামকৃষ্ণ পাগল হবে কেন? তাতে যে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। তার জন্যে ভাব্‌ছ কেন?" স্বপ্নে শিবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধার মন শান্ত হইল।

রামকৃষ্ণ প্রায় প্রত্যেক বৎসর পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে যাইতেন। এক বৎসর তিনি তাঁহার প্রিয় সেবক হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে গেলেন। তথায় যাইয়া তিনি

মণি সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়া আছেন, এদিকে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে না দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন, "এখানে কোন মহাপুরুষের আগমন হয়েছে?" এই কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণবচরণ চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে যথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবচরণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরে ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "ইনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে থাকেন।"

বৈষ্ণবচরণ কহিলেন, "তবে আমরা কলিকাতায় যাবার সময় ঐ স্থানে নেমে যাব।"

কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবচরণ পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে লইতে অনুমতি করিলেন এবং সেই অর্থে আম, চিঁড়া, মুড়কী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। হৃদয় ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলে পর, বৈষ্ণবচরণ ও অপরাপর সকলে মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া মহা আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার ভাব হইয়া পড়িলে, বৈষ্ণবচরণ সেই সকল ভোগের সামগ্রী হইতে কিঞ্চিৎ তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের তাহা গলাধঃকরণ হইল না, তিনি ভাবসমাধিস্থ রহিলেন, খাইতে পারিলেন না। বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য সকলে সেই প্রসাদ ধারণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবচরণ সেই দিবসই বাষ্পীয়-পোতযোগে কলিকাতায় আসিবার পথে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়াছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হওয়ায় সাক্ষাৎ হয় নাই। রামকৃষ্ণদেব আসিয়া শুনিলেন,

বৈষ্ণবচরণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পরে বৈষ্ণবচরণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের উন্মত্ত ভাবের কথঞ্চিৎ সাম্য হইলে, আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল—গাত্রদাহ। এক মালসা 'আগুন' রাখিলে যেমন বক্ষের মধ্যে উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, বুকের ভিতর সেইরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন। তাহা নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই দারুণ যন্ত্রণার উপশম হইল না। গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া গঙ্গার জলে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কিছুতেই কিন্তু যন্ত্রণার উপশম হইত না। এক ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিতে বলেন এবং তাহাতেই অল্প দিনে ঐ গাত্রদাহ অনেক অংশে নিবারিত হয়। ভৈরবী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে "বামনী" বলিতেন। কিন্তু যন্ত্রণা একেবারে নিবারিত হয় নাই। বারাসাত-নিবাসী মোক্তার শ্রীরাম-কানাই ঘোষাল একজন শক্তিমন্ত্রোপাসক ছিলেন, মায়ের পূজা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইতেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহিত এবং তদবস্থায় কখন মাকে আদর করিয়া ডাকিতেন, আবার কখন বা মাকে নানাবিধ গালাগালিও করিতেন। এইজন্য রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বীরভক্ত বলিতেন। অবশেষে কিছুদিন পরে এই ঘোষাল মহাশয় রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হই-লেন ও একখানি কবচ লিখিয়া তাঁহাকে ধারণ করাইলেন। এই কবচ পরিয়া যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপশম হইল।

* রামকানাই ঘোষাল মহাশয়ের কবচের কথা আমরা স্বামী শিবানন্দের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুনরায় তাঁহার মনের আবেগ বাড়িতে লাগিল; সদাই আপনার ভাবেই আছেন, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না; আপনার মনে যখন যাহা উদয় হয় তখনি তাহাই করেন, কখন নাটমন্দিরে বসিয়া শ্যামা-মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, কখন বা সর্ব্ব-সমক্ষে উলঙ্গ হইয়া ধ্যান; কখন উলঙ্গ হইয়া নৃত্য, কখন আপনার ভাবে আপনি হাস্য, কখন ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন, আবার কখন বা নানা পুষ্প চয়ন করিয়া আপনি আপনাকে পূজা করেন। এইরূপ-ভাবে আছেন, এমন সময়ে এক দিন ভাবাবস্থায় দেখিলেন, নীলাম্বরা গজমতিভূষিতা সীতাদেবী তাঁহার নিকটে আসিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন, এবং ঠিক সেই সময় একটা হনুমান হুপ্ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি হনুমানের ভাবে থাকিয়া ক্রমাগত 'রঘুবীর' 'রঘুবীর' বলিয়া চীৎকার করিতেন, ফল মূল ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করিতেন না; আমূল তুলসী গাছ তুলিয়া রঘুবীরের পূজা করিতেন; এবং কখন কখন কাপড়ের লাঙ্গুল পারিয়া বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রকে ডাকিতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাসমণির দেবালয়ে সাধু সন্ন্যাসীর অনেক সমাগম হইত। এই সময়ে পঞ্চবটীর নিকট একদিন এক জটাধারী রামাইৎ বৈরাগী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার নিকট একটি রামলালা বা বালকবেশী রামচন্দ্র ঠাকুর ছিল। তিনি সর্ব্বদা সেই ঠাকুরটীকে ক্রোড়ে বা বক্ষে করিয়া রাখিতেন। গঙ্গায় স্নান করিতে করিতে কখন কখন চীৎকার করিয়া বলিতেন, "ওরে অত জলে যাস্‌নি, ডুবে যাবি। আয় এইদিকে আয়।" স্নান করিয়া রামলালাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেন, তাহার পর যখন পূজা করিয়া ভোগ দিতেন, তিনি প্রত্যক্ষ রামলালাকে আহার করিতে দেখিতেন।

রামকৃষ্ণ এই রামাইৎ বৈরাগীর নিকট হইতে রামাইৎদিগের ভেক গ্রহণ করেন এবং তিন দিন ঐ ভেক ধারণ করিয়াছিলেন।* ইহার পরে উক্ত জটাধারী বাবাজী কিন্তু রামলালাকে পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রত্যক্ষ করিতেন না। জটাধারী বাবাজী দেখিতে লাগিলেন, রামলালা আর তাঁহার সঙ্গে না থাকিয়া সর্ব্বদা রামকৃষ্ণের সঙ্গেই থাকে। জটাধারী ইহা দেখিয়া অতি বিষণ্ণ বদনে রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "রামলালা আর আমার কাছে আসে না, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবে আর আমি কার সেবা কর্‌বো?" এই বলিয়া তিনি রামলালা-মূর্ত্তিটি রামকৃষ্ণকে প্রদান করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। অদ্যাবধি সেই রামলালা ঠাকুর রাণী রাসমণির দেবালয়ে আছেন এবং অদ্যাপিও তাঁহার রীতিমত নিত্যসেবা চলিতেছে।

রামকৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ হন, পৈতা ফেলিয়া দেন, কাপড়ের লাঙ্গুল পরিয়া বটবৃক্ষের শাখার উপর বসিয়া রঘুবীর বলিয়া চীৎকার করেন; হলধারী এই সমস্ত দেখিয়া ভাবিতেন রামকৃষ্ণ পাগল, আবার কখন স্থির করিতেন—ইনি কোন উপদেবতাগ্রস্ত,আবার কখন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হৃদয়কে অন্তরালে কহিতেন, "হৃদু, এ কাপড় ফেলে দেয়, পৈতে ফেলে দেয়, এ বড় দোষের কথা, কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, এ সেই ব্রাহ্মণের অভিমান ত্যাগ কর্‌তে চায়, এর এমন কি অবস্থা হয়েছে? তুমি একে বেঁধে রাখ। তোমার কথা ও অনেক শোনে, তোমাকে অনেকটা মানে, যাতে পৈতে না ফেলে দেয় তা কর।" এই কথা বলিয়াই পুনর্ব্বার কহিলেন, "আচ্ছা হৃদু, তুমি কি এঁর ভেতর কিছু দেখেছ?"

* হৃদয়ের নিকট প্রাপ্ত।

হৃদয় উত্তর করিল, "মামা, তা না দেখ্‌লে কি আমি এত সেবা করি? আমি ইঁহার মলমূত্র হস্তি দিয়ে ফেলি, না দেখলে কি এ রকম সেবা কর্‌তে পারি? কৈ আর কারো ত এ রকম করি নি?"

হলধারী রামভক্ত। তিনি রামকৃষ্ণকে একদিন বলিলেন, "কালী তামস মূর্ত্তি, তার আরাধনা কর্‌লে অধোগতি হয়। তুমি কেন কালীর আরাধনা কর?" রামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কালীমন্দিরে যাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুই কি তামস?" তৎপরে তিনি জানিতে পারিলেন, না তামস নহে, শুদ্ধ সত্ত্ব। তিনি এই কথা জানিয়াই হলধারীর অন্বেষণে গেলেন। হলধারী পূজা করিতেছিলেন, এমন সময় রামকৃষ্ণ যাইয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া কহিলেন, "তুই মাকে তামস বলিস্? মা কি তামস? মা যে শুদ্ধ সত্ত্ব" হলধারীর তখন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইল এবং তিনি ফুলচন্দন লইয়া রামকৃষ্ণের পদে দিয়া পূজা করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু কহিলেন, "এর পরে তোমার আর এ সব মনে থাক্‌বে না।"

হলধারী বলিলেন, "থাক্‌বে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "না তুমি সব ভুলে যাবে।" হৃদয় ইহা দেখিয়া হল ধারীকে একদিন বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "মামা, তুমি ওঁকে পূজা কর্‌লে কেন?"

হলধারী কহিল, "কি জানি হৃদু, আমাকে তখন এমন কি একটা ক'রে দিলে যে আমি সব ভুলে গেলুম। এঁর কাছে যখন থাকি, তখন এঁর ভেতর ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখ্‌তে পাই।"

রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"হলধারী রুক্ষ তার্কিক ছিল, কিন্তু আমার সম্মুখে আমাকে কিছু বলিতে পারিত না, বরং আমার ভিতর ঈশ্বরের

আবির্ভাব মানিত। কিন্তু যখন একেলা বসিয়া নস্য লইয়া বিচার করিতে অথবা গীতা ভাগবৎ পাঠ করিতে বসিত, তখন নিশ্চয় করিত যে,আমাকে উপদেবতায় পাইয়াছে। তাহার পর এক দিবস যখন দেখিল,গাছের উপর উলঙ্গ বসিয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতেছি, তখন পাকা ধারণা করিল যে, আমাকে ব্রহ্মদৈত্যতে পাইয়াছে।"

দক্ষিণেশ্বরের জনসাধারণেও রামকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া স্থির করিল। হৃদয় ভাবিলেন, 'হবেও বা' এবং তাঁহার মাতুলের যদি যথার্থই বায়ুরোগ হইয়া থাকে, তবে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই স্থির করিয়া তিনি রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া একদিন কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট গেলেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার লক্ষণাদি দেখিয়া মধ্যমনারায়ণতৈল মর্দ্দন ও চতুর্ম্মুখ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিছুদিন নিয়মমত সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাইতেন। কিন্তু রোগের কিছুমাত্রও উপশম হইল না। একদিন কবিরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, সেখানে অপর একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিরাজ কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের লক্ষণাদি দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি কোন প্রকার যোগ অভ্যাস করেন?" হৃদয় কহিলেন, "সাধনাদি করেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদকে কহিলেন, "ইনি ত দেবোন্মাদ; ঔষধাদির দ্বারা আরোগ্য হ'বার নয়।" গঙ্গাপ্রসাদও তজ্জন্য ঔষধাদি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবও তদবধি আর ঔষধাদি ব্যবহার করিতেন না।

শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ ঠিক্ বুঝিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণ সাধারণ পাগল নহেন, দেবোন্মাদ, ইহার আর চিকিৎসা কি হইতে পারে? এইরূপ

উন্মত্ত অবস্থায় মা কালীর নিত্যপূজা তাঁহার দ্বারা অসম্ভব হইয়াছিল; স্নানের সময় যে দিন মনে হইত, সে দিন তর্পণ করিতেন, নতুবা নহে। এক দিন স্নানান্তে তর্পণ করিবার মানসে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া গঙ্গোদক তুলিতে গিয়া অঙ্গুলিগুলি একেবারে এমন বাঁকিয়া গেল যে জল উঠিল না। পুনরায় অঞ্জলি করিয়া জল তুলিবার চেষ্টা করিলেন, হস্তদ্বয় জলমধ্যে বেশ অঞ্জলিবদ্ধ রহিল কিন্তু অঞ্জলিস্থ জল উপরে তুলিবামাত্র পূর্ব্ববৎ অঙ্গুলি বাঁকিয়া সমস্ত জল পড়িয়া গেল। উপর্যু্য-পরি চেষ্টা করিয়াও সেদিন তাঁহার আর তর্পণ করা হইল না। ইহার পরে তর্পণ করিবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জল তুলিতে গেলেই অমনি অঙ্গুলিগুলি বাঁকিয়া জল পড়িয়া যাইত, তর্পণ করা আর হইত না।

এক সময়ে তাঁহার এমন একটী ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহার সম্মুখে কেহ ঘাসের উপর দিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মনে হইত যেন তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যথার্থ বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেলে যেমন যন্ত্রণা হয় সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এই ভাবটী আন্দাজ ছয় ঘণ্টা কাল ছিল।

ইহার পূর্ব্বে এক সময়ে বাহ্য পূজা ত্যাগ করিয়া তিনি মানস পূজা করিতে আরম্ভ করেন। মানস পূজা করিতে বসিয়াই তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকালীর নিকট প্রার্থনা করিতেন—"মা আমার জ্ঞান অজ্ঞান যাক্ মা, আমায় তুই শুদ্ধা ভক্তি দে মা। এই নে তোর শুচি, এই নে তোর অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে মা।" এই মানস পূজা করার পর হইতেই তাঁহার ভাবের প্রগাঢ়তা বাড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত উন্মাদ অবস্থা আসে। এক সময়ে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সমস্ত দিবস যে কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল তাহা জানিতে পারিতেন না।

সন্ধ্যার আরাত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্যের শব্দে দিবাবসান বুঝিতে পারিয়া করুণ স্বরে কহিতেন, "আর একদিন গেল মা তবু তুই দেখা দিলি নি মা?"

কখন কখন ভাবের প্রগাঢ়তায় এমন বিভোর অবস্থায় কিছুদিন থাকিতেন যে অতি সামান্য আহার অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করান হইত। এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে তাঁহার একটু সহজ-ভাব আসিল। এই সময়ে তিনি হলধারীর চরিত্রসম্বন্ধে লোক মুখে নিন্দা শুনিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য হলধারীকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। হলধারী অতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, "আমি তোর বড় ভাই, আমায় তুই এমন কথা বলিস্? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে।" তিনি হলধারীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। ইহার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার তালু হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। রক্তের বর্ণ সবুজ, যেন সিম পাতার রস এবং এত গাঢ় যে মুখের বাহিরে ঐ জমাটবাঁধা রক্ত দড়ার মত ঝুলিতে লাগিল। হলধারী এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "দাদা তোমার শাপ ফলে গেল এখন কি করি?" হলধারীও কাঁদিতে লাগিলেন; সকলে ভীত হইলেন।

ঘটনাক্রমে একজন সন্ন্যাসী দেবালয়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র রামকৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিলেন। পরে কহিলেন, "ভয় নাই, রক্ত বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা কোরো না। এতে তোমার মহা উপকার হয়েছে, তোমার সহস্রারে সুষুম্নামার্গ খুলে গেছে। রক্ত বেরিয়ে না গিয়ে যদি ঐ রক্ত মাথায়

উঠে যেত, তা হলে তোমার শরীর থাকতো না।” সাধুটীর ঐ আশ্বাস বাক্যে সকলের ভয় দূর হইল; পরে রক্তস্রাব আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার বক্ষের মধ্যদেশে রক্ত জমিয়া একটী গোলাকার ফোস্‌কার ন্যায় হইয়া উঠিল এবং ক্রমে তাহা বাড়িতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেবের সেবক হৃদয় ভূকৈলাস হইতে এক জন বৈদ্য আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে সেই চিকিৎসাতেই তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দিবাভাগে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইতেন আবার মধ্যে মধ্যে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেন; কিন্তু এই ঘটনার পরেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শিবনেত্র হইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকিতেন. এবং দিবারাত্রে তিলার্দ্ধ সংজ্ঞা হইত না। তাঁহাকে আহার করান যায় না। সেই সাধুটী এই অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, “এ অতি উচ্চ অবস্থা, কিন্তু আহার করাতে না পার্‌লে শরীর থাক্‌বে না।” সাধু সেজন্য আহারীয় দ্রব্য আনিয়া ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি এবং কখন কখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীরে আঘাত পর্য্যন্ত করিতেন এবং তাঁহার মন দেহের প্রতি ক্ষণিক নামিয়া আসিলে, অমনি কিছু খাদ্য তাঁহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। এইরূপে কথঞ্চিৎ আহার তাঁহার উদরস্থ হইত। দুই চারি গাল না খাইতে খাইতেই রামকৃষ্ণদেব আবার পূর্ব্ববৎ বাহ্যশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাদিক্রমে ছয় মাস ছিলেন এবং ঐ সাধুও ঐ ছয় মাস কাল আর কোন দিকে মন না দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরটা কেমন করিয়া থাকিবে এই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সাধু জানিতে পারিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা জগতে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে সেইজন্যই তিনি ঐ চেষ্টায় ব্যাপৃত হন।

রামকৃষ্ণদেব এখনও দিবানিশি সেই একই প্রকার উন্মত্তাবস্থায় আছেন, মন্দিরে যাইয়া পূজা করেন না বটে কিন্তু প্রায় প্রত্যহই পুষ্পচয়ন করিয়া মা-কালীর মন্দীরে এবং পঞ্চবটীতে দিয়া আসেন, আর হৃদয় পূজা করেন। এক দিন তিনি ভাবাবেশে মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা তুই নিজে শেখাস্ ত আমি শিখি, আমি ত কি কর্‌ব কিছুই জানি নি।" তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিবার কিছুদিন পরে এক দিবস প্রাতঃকালে ফুলের সাজি হস্তে জাহ্নবী তীরে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, গৈরিকবসনা আলুলায়িতকেশা, একজন সন্ন্যাসিনী নৌকা হইতে বকুলতলার ঘাটে নামিতেছেন।

রামকৃষ্ণদেব আপন কক্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হৃদয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ হৃদু, ও ঘাটে একজন স্ত্রীলোক এসেছে, গেরুয়া পরা, তাকে ডেকে আন ত।" হৃদয় সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিলেন। একান্ত প্রিয়জনের দীর্ঘবিচ্ছেদে কাতর ও তাহার অন্বেষণে বিফলকাম ব্যক্তির পূর্ণ নৈরাশ্যের সময় হঠাৎ তাহার দর্শনে মনে যে প্রকার আবেগ উপস্থিত হয়, সন্ন্যাসিনী সেই দেবপ্রভাযুক্ত রামকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে তদ্রূপ ভাবার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেবও ভাবাবিষ্ট।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রয়েছ? আমি জান্‌তে পেরেছি, আমায় তিন জনকে সন্ধান করে বার কর্ত্তে হবে। তার দুজনকে পূর্ব্বদেশে পেয়েছি, আর একজন গঙ্গার ধারে আছে জেনে, এতদিন ধরে খুঁজ্‌ছিলুম, এখন পেলুম।"

সন্ন্যাসিনী পরিচয় দিলেন, তিনি ব্রাহ্মণী, নিবাস যশোহর জেলায়, যোগবলে জানিতে পারেন, তিন জন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আছেন। তাহার মধ্যে দুইজনের নাম চন্দ্র ও গিরিজা; বরিশাল অঞ্চলে

উঁহাদের নিবাস; 'আর একজন জাহ্নবী তীরে আছেন।' ব্রাহ্মণী ইতিপূর্ব্বে চন্দ্র ও গিরিজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে যাহা যাহা বলিবার আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা বলিয়াছেন। এখন তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন। শেষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে এত দিনের পর তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। তিনি সেই আনন্দে অশ্রু বর্ষণ এবং আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিলেন।

হৃদয় বলেন—এই সময় সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন কালে রামকৃষ্ণদেব বামপদ অগ্রসর করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিচরণ করিতেন। ব্রাহ্মণীর ইহা দেখিয়া প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে স্বর্ণসাজি হস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন।

রামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মণীর পরিচয় এবং তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল সমস্ত শ্রবণ করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা আমার এ কি হয়, বল্‌তে পার?" এই বলিয়া তাঁহার যে যে অবস্থা হইত সমস্ত ব্রাহ্মণীকে জানাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবাই আমাকে পাগল বলে, সত্যি সত্যি কি পাগল হলুম?"

ব্রাহ্মণী ভক্তি-সমুজ্জ্বল নয়নে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তোমার ত এ পাগলামি নয়। এ যে মহাভাবের লক্ষণ। চৈতন্যদেবেরও ঐ রকম হয়েছিল। এ সব যে শাস্ত্রে আছে।" এই কথা বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল আনাইয়া তাহা হইতে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেবের যে সকল অবস্থা হইয়াছিল সমস্ত গুলি ঐ সকল শাস্ত্রের বচনের সহিত

মিলাইয়া দিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমার কি এ পাগলামি? তোমায় কেউ চিন্‌তে পারেনি;—

'অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার॥
কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।
অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥—

বাবা, সেই চৈতন্যদেব তুমি উদয় হয়েছ—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।" এই কথা শুনিবামাত্র প্রভুদেব বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, আর অমনি ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন, "এই ভাব হল। বাবা তুমি জীব উদ্ধারে এসেছ, তোমায় এখন পাগল বলুক, এর পরে সবাই তোমায় পূজো করে মুক্তি পাবে। কিন্তু তুমি আপনি না চেনা দিলে কে তোমায় চিন্তে পারবে?" ইহার পূর্ব্বে ভাব কাহাকে বলে, দক্ষিণেশ্বরের কেহ জানিতেন না; ব্রাহ্মণীর নিকটে শ্রবণ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণদেবের যে মূর্চ্ছার ন্যায় অবস্থা হইত, যাহাকে সকলে মৃগীরোগ বলিয়া নির্ণয় করিতেন তাহাকে শাস্ত্রে ভাবসমাধি বলে। ব্রাহ্মণী ঐ সমস্ত বিভিন্ন ভাবাবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন ও বলিতেন,—ইহা ভাবাবস্থা, ইহা প্রেমের অবস্থা, ইহাকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কহে ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণীর সহিত এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর প্রভুদেব হৃদয়কে ব্রাহ্মণীর জন্য সিধা দিতে আজ্ঞা করিলেন। হৃদয় ঘৃত ময়দা প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। প্রভুদেব ব্রাহ্মণীকেই সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পঞ্চবটীতে পাক করিতে কহিলেন। হৃদয় বলেন—ব্রাহ্মণীর নিকট একটী রঘুবীর শিলা ও একটী গোপাল মূর্ত্তি ছিল। তিনি পাকান্তে

সেই ঠাকুরদ্বয়ের ভোগ নিবেদন-পূর্ব্বক ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ প্রভুদেব তথায় আসিয়া সেই ভোগের লুচি তরকারি খাইতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণী চক্ষু চাহিয়া অবাক্! তাঁহার নয়ন হইতে শ্রদ্ধাশ্রু পড়িতে লাগিল, তিনি কহিতে লাগিলেন, "এত দিনের পর আমার পূজা করা সার্থক হল! আর এখন আমার পূজা কর্‌বার আবশ্যক নেই।"

'মা তুই নিজে এসে শেখাস্ ত শিখি'; মা কালীর নিকট প্রভুদেবের এই প্রার্থনা সমাগতা ব্রাহ্মণী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণী অতি পণ্ডিতা, সর্ব্বশাস্ত্র তাঁহার পড়া ছিল, ঈশ্বর প্রেমে সদাই বিহ্বলা, প্রৌঢ়া হইলেও দেখিতে দেবীসম সুন্দরী। দিবানিশি রামকৃষ্ণদেবের নিকটে থাকিয়া চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিতেন।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাল অতীত হইলে প্রভুদেব তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ, তুমি এখানে থাক্‌লে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে। একটা বদনাম হবে। তুমি দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের বাড়ী, নবীন মণ্ডলের স্ত্রীর কাছে যাও। সে খুব ভাল স্ত্রীলোক, তোমাকে ভারি যত্ন কর্‌বে, থাকবার স্থান দেবে।" ব্রাহ্মণী তাহাই করিলেন। নবীন মণ্ডলের বাটী যাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং দেবমণ্ডলের ঘাটের একটী কুঠরীতে থাকিবার স্থান দিয়া, একমণ চাউল, তাহার উপযুক্ত দাল ঘৃত লবণ প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যাদি আনাইয়া দিলেন। এই প্রকার আতিথ্যে ব্রাহ্মণী পরম তুষ্ট চিত্তে প্রভুদেবের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বাবা, এ সমস্ত তোমার খেলা, তুমি আগে থেকে সব যোগাড় করে রেখে আমাকে পাঠিয়েছেলে। আমি যাবামাত্র তখনি খুব যত্ন করে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিলে।"

ব্রাহ্মণী তদবধি সেই স্থানেই আহারাদি ও রাত্রি যাপন করিতেন, আর আবশ্যক মত সাধনার দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া আনিয়া প্রভুদেবের সহায়তা করিতেন। মা কালীর নিকট রামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনা এইরূপে পূর্ণ হইল।

ব্রাহ্মণী আসিয়া চৈতন্যদেবের কথা কহিতেন, চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেন বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তৎপরে একদিন তিনি ভাবাবস্থায় চৈতন্যদেবকে অবতার ভাবে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ধর্ম্মসংক্রান্ত যাহা আপনি সমাধিস্থ হইয়া অবগত হইতেন তাহাই মানিতেন তদ্ভিন্ন কাহারও কোন কথায় ভুলিতেন না।

পূর্ব্বে প্রভুদেবের যে বিপরীত গাত্রদাহের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই ব্রাহ্মণীরই উপদেশে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া ও উত্তম ফুলের মালা পরিয়া একেবারে নিবারিত হইল। একদিন প্রভুদেব ব্রাহ্মণীকে কহিলেন যে তাঁহার ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। পরদিন ব্রাহ্মণী বহু পরিমাণে নানাবিধ ভোজ্য বস্তুর আয়োজন করিয়া একটী ঘর সজ্জিত করিলেন; তৎপরে রামকৃষ্ণদেবকে তথায় আনয়নপূর্ব্বক সেই সমস্ত দেখাইলেন। কেবল সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্যাদি অবলোকন মাত্রেই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল!

রামকৃষ্ণদেবের যখন যেরূপ সাধনা করিতে ইচ্ছা হইত তিনি তাহা ব্রাহ্মণীকে বলিতেন, আর ব্রাহ্মণী সেই সমস্ত সাধনার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নানা স্থান হইতে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দিতেন। তন্ত্রসাধনার জন্য 'পঞ্চমুণ্ডির আসন' আবশ্যক হইলে বহুদূরস্থ শ্মশান হইতে পাঁচটী মড়ার মাথা সংগ্রহ পূর্ব্বক উদ্যানের উত্তর সীমায়

একটী বিল্ব বৃক্ষের তলে সেইগুলি প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই বেদীর উপর উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। সমস্ত সাধনকার্য্য শেষ হইলে পর একটী মুণ্ড তুলিয়া তিনি গঙ্গায় নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত সাধনায় যে যে স্থলে সুরাপানের ব্যবস্থা আছে রামকৃষ্ণদেব সে স্থলে কারণ আনাইয়া তাহা অঙ্গুলীর দ্বারা আপন কপালে স্পর্শ করিতেন মাত্র। ব্রাহ্মণী তাঁহার অজ্ঞাতসারে নানাপ্রকার গুপ্ত সাধনার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে আহ্বান করিতেন; কিন্তু তিনি সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া সাধনায় বসিবামাত্র এবং কখন কখন আয়োজন দর্শন মাত্রেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। আর ব্রাহ্মণীও বলিত 'বাবা! ঐ সকল সাধনা করিতে করিতে যে ভাব সমাধি উপস্থিত হয় তাহা তোমার পূর্ণভাবে উদয় হইয়াছে। আর ও সাধনার আবশ্যক নাই।" এই সকল সাধনকালে তাঁহার নানাবিধ অবস্থা উপস্থিত হইত। যখন ধ্যানস্থ হইতেন পক্ষিগণ স্থাণুবৎ স্থির দেখিয়া তাঁহার মস্তকোপরি বসিয়া তাহা হইতে আত্ম পূজার শস্যকণা সকল খুঁটিয়া খাইত। তিনি অনাহত শব্দ শুনিতে পাইতেন যেন সমস্ত জগৎ সমস্বরে ওঙ্কারধ্বনি করিতেছে; ইত্যাদি।

হৃদয় বলেন—ব্রাহ্মণীর আগমনের কিছুদিন পরে এক দিবস রামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীতে উপবিষ্ট, নিকটে মথুর ও হৃদয় আছেন। ঈশ্বরীয় নানা কথা হইতেছে, রামকৃষ্ণদেব মথুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে এসেছে; সে আমাকে বলে অবতার।"

এই কথা শুনিয়া মথুর কহিলেন, "আচ্ছা, অবতার ত দশটী।

ে ছাড়া ত অবতার নাই ; অবতার কি করে হতে পারে? মা কালীর দয়া হয়েছে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "সে বলে আমি অবতার। তার কাছে অনেক পুঁথি আছে, আর সে সব শাস্ত্র জানে। সে বলে, শাস্ত্রে আছে, তোমার যে যে লক্ষণ হয় সে সব অবতার ভিন্ন মানুষে কখন হতে পারে না।"

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণী হস্তে একখানি থালায় নানারূপ মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ কি সেই ব্রাহ্মণী?"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "হ্যাঁ ঐ সেই।" ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবের নিকটে আসিয়া রোদন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। হৃদয় অমনি ব্রাহ্মণীর হস্তস্থিত থালাখানি লইয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে ধরিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে পর সকলে সেই প্রসাদ ধারণ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া মথুরানাথকে কহিলেন, "ইনি আমাকে অবতার বলেন।"

মথুরানাথ প্রশ্ন করিলেন, "এ কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে?"

ব্রাহ্মণীর ভক্তি শাস্ত্র সকল কণ্ঠস্থ ছিল ; তিনি সেই সকল গ্রন্থ হইতে শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্যদেব ও অন্যান্য অবতারের লক্ষণের সহিত রামকৃষ্ণদেবের লক্ষণাদি মিলাইতে লাগিলেন। মথুরানাথ সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে যাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহার সহিত প্রভুদেবের কথা কহিতেন, এবং অনেকে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া প্রভুদেবকে

দর্শন করিয়া যাইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণী রামকৃষ্ণদেবকে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া মন্দিরস্থিত ও নিকটবর্ত্তী অনেকে প্রভুদেবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিয়া অবধি প্রায় প্রত্যহই রামকৃষ্ণদেবকে বলিতেন, "বাবা, চন্দ্র বড় ভাল লোক। সে আমায় 'মা মা' করে। গিরিজা আর চন্দ্র দুজনেই খুব ভাল লোক। তুমি বল ত তাদের চিটি লিখে আনাই।"

রামকৃষ্ণদেব এ কথায় প্রায় কোনই উত্তর দিতেন না, পাঁচ কথায় ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবটী চাপা পড়িয়া যাইত। এক দিবস তিনি ব্রাহ্মণীকে পত্র লিখিবার অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণী পত্র লিখিয়া চন্দ্রকে দেব মণ্ডলের ঘাটে আনাইলেন। যে দিবস চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই দিবস ব্রাহ্মণী সাহস করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে তথায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু চন্দ্রের আগমন বার্ত্তা গোপন রাখিলেন। ব্রাহ্মণীর নিকট চন্দ্র উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণী অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত অন্য কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব দুই একটী মাত্র কথা কহিয়াই ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং সেই অবস্থায় জানিতে পারিলেন যে চন্দ্র আসিয়াছেন। চন্দ্রের আগমন জানিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এই যে চন্দ্র! হ্যাঁগা এঁর নাম চন্দ্র না?" তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে স্থাণুবৎ স্থির হইয়া গেলেন। চন্দ্র এই সময়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক "ও রামকেষ্ট,ও রামকেষ্ট" তিন চারি-বার বলিয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিলেন; এবং কহিলেন, "আপনি আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন কিন্তু এত দিন কেন আমায় ভুলে ছেলেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

চন্দ্র কহিলেন "আপনিই ত ঈশ্বর আপ্‌নার কেন ভুল হয়?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেহ ধারণ কল্লেই ভুল হয়।"

চন্দ্র এইরূপ যখন ইচ্ছা করিতেন রামকৃষ্ণদেবের প্রগাঢ় সমাধিও ভঙ্গ করিতে পারিতেন। রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার অত্যন্ত সুখ্যাতি করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। চন্দ্র পরম ভক্ত, রামকৃষ্ণদেব কহিতেন তাঁহার ভিতর প্রভূত বিষ্ণু শক্তি আছে। চন্দ্র সেই শক্তির দ্বারাই রামকৃষ্ণদেবের প্রায় সকল প্রকার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিতেন। যে সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য হৃদয় ও অন্যান্য সকলে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই সেই সমাধি অবস্থায় চন্দ্র দুই চারিবার রামকৃষ্ণদেবের হস্ত ধরিয়া ডাকিলেই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আসিয়া পড়িত। ইহা দেখিয়া সকলেই মহা আশ্চর্য্য হইতেন। চন্দ্র একজন যথার্থই মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে তাহা বোধ হইত না। তিনি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়া গোঁপে চাড়া দিয়া থাকিতেন। সেই জন্য হৃদয় বলিতেন, "মামা, এ যে বদমায়েস, একে তুমি ভালবাস কেন?"

ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিতেন, "নারে তুই জানিস্‌নি। ওর বড় উঁচু অবস্থা আমি জান্‌তে পেরেছি।"

এক দিন হৃদয়ের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে অন্তরালে কহিলেন, "হৃদে, ওকে গেরুয়া পরিয়ে দে দেখি, তা'হলে বুঝতে পার্‌বি।" হৃদয় তাহাই করিলেন। চন্দ্র গৈরিক বসন পরিবামাত্র একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ

হইয়া গাত্র কাঁঠালের মতন বোধ হইতে লাগিল; তখন রামকৃষ্ণদেব হাঁসিতে হাঁসিতে হৃদয়কে কহিলেন, "দেখলি হৃদু দেখ্‌লি?"

এক দিবস রামকৃষ্ণদেব কালী মন্দিরের রকে পাদচারণ করিতেছেন, আর মথুরানাথ ছাদের উপর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। মথুর কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবার পর ছাদ হইতে দৌড়িয়া নামিয়া আসিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবের চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "বাবা তুমি কখনও মানুষ নও। তুমি কে আমায় দয়া করে বল বাবা। আমি তোমাকে দেখলুম সাক্ষাৎ শিব বসে আছ। বাবা তুমি আমায় কৃপা কর, বল তুমি কে, আমার জন্ম সার্থক হোগ্।"

রামকৃষ্ণদেব তাঁহার পদদ্বয় মথুরের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া সেই স্থানে পূর্ব্ববৎ পাদচারণ করিতে লাগিলেন কোনও উত্তর করিলেন না। ভাবে বিভোর হইয়া তিনি আগে আগে যাইতেছেন মথুরানাথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাদচারণ করিতেছেন, দুইজনেই নীরব; মথুরের চক্ষু আর অন্য কোন বস্তু দেখিতে যেন ইচ্ছুক নহে, কেবল রামকৃষ্ণ দর্শনে পিপাসু হইয়া তাঁহার রূপেই আবদ্ধ। মথুর কখন দেখিতেছেন রামকৃষ্ণের শরীর শিবরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন কখন বা কালীরূপ ধারণ করিয়া আবার কখন বা রামকৃষ্ণরূপেই বেড়াইতেছেন। এই ব্যাপার অবলোকন করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "ছায়া পড়ে কি না দেখি?" এই ভাবিয়া মথুর যেমন ছায়া দেখিবেন অমনি রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মথুর কি দেখ্‌ছ? ছায়া পড়ে কি না? স্থূল শরীরের ছায়া পড়্‌বে বই কি। সূক্ষ্ম শরীরের ছায়া পড়ে না।" রামকৃষ্ণদেবের এইরূপ অভ্রান্ত ঐশীভাব ও ঐশী শক্তিতে মথুর দিন দিন বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

একদিন মথুরানাথ মন্দিরে বসিয়া ইষ্ট পূজা করিতেছেন এমন সময় রামকৃষ্ণদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে আপন সমক্ষে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চরণে অর্ঘ্য জবা বিল্বাদি দিয়া আপন ইষ্টপূজা সমাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। এই ঘটনার পরে মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে মন্দিরে পাইলেই মহা আনন্দে তাঁহার চরণ পূজা করিতেন।

মথুরানাথ পরম শ্যামাভক্ত, এজন্য তিনি প্রতি মঙ্গলবার শনিবার অমাবস্যা পূর্ণিমায় কালীঘাটে যাইয়া ষোড়শোপচারে শ্যামাপূজা করিতেন। কালীঘাটের হালদার বংশীয় এক ব্যক্তি তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যে পৌরোহিত্য এবং তদ্দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জনও করিত। মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে আপনার ইষ্টদেবতার দর্শন পাইয়া অবধি তাঁহার প্রতি ক্রমে ক্রমে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। হালদার পুরোহিত মথুরানাথের ভাবান্তরের কথা জানিতে পারিয়া মনে করিল, রামকৃষ্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনরূপ মন্ত্র তন্ত্রের সাহায্যে মথুরকে হাত করিয়াছে। সে এতদিন ধরিয়া কিছু করিতে পারিল না আর রামকৃষ্ণ যজমানকে তাহার এই অল্পকালে হাত করিয়া ফেলিল—এই চিন্তায় তাহার অন্তর হিংসানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবস্থ মাটীতে পড়িয়া আছেন দেখিতে পাইয়া হালদার নিকটে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে বারম্বার বলিতে লাগিল "ও বামুন্ বল্‌না আমার যজমানটাকে কি করে হাত কর্‌লি ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তখন ভাবাবস্থা অন্তর্হিত হইয়া অল্পে অল্পে বাহ্যজ্ঞান আসিতেছে মাত্র—কাজেই কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পুরোহিত তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া

গেল। সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রামকৃষ্ণদেব ঐ হালদারের ব্যবহারের কথা আর কাহারও নিকট ভাঙ্গিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মথুরানাথ এ কথা শুনিলে একটা খুনোখুনি কাণ্ড উপস্থিত করিবে। কাজেই ও কথা একেবারে চাপিয়া গেলেন। শুনা যায় উক্ত হালদারের পরিশেষে অনেক দুর্গতি হইয়াছিল এবং কোন বিশেষ দোষে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া রাণী রাসমণির বাটীর পৌরোহিত্য কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির বাটী হইতে ঐরূপে তাড়িত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহার ব্যবহারের কথা একদিন মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন। মথুর তাহাতে ক্রোধে ক্ষোভে বারম্বার বলিয়াছিল—"বাবা, এ কথা আমাকে আগে বলনি কেন? ব্যাটার মাথা নিতাম্" ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সেই জন্যই বলিনি।"

রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরনিবাসী কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকট অধ্যাত্ম রামায়ণ শুনিতে যাইতেন। একদিন তিনি শুনিলেন রামায়ণ শুনিলে বা রাম নাম করিলে মানুষ পবিত্র হয় "কোন ময়লা থাকে না।" ইহার দিন কয়েক পরে তিনি কৃষ্ণকিশোরের বাটী গিয়া শুনিলেন কৃষ্ণকিশোর শৌচে গিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং কৃষ্ণকিশোর আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ, আমি জান্তুম্ তুমি নির্ম্মল হয়েছ, তোমার আর কোন ময়লা নেই, তুমি শৌচে যাও?"

রামকৃষ্ণদেব সরল বালকের মত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণকিশোর করজোড়ে তাঁহার নিকট কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, "এই রকম সরল বিশ্বাস হলে তবে ভগবান্ লাভ হয়।" কৃষ্ণকিশোর অহর্নিশি ভগবানের নাম করিতেন। কোন কার্য্যবশতঃ দক্ষিণেশ্বর

হইতে কলিকাতায় গমন করিতে হইলে তিনি 'রাম রাম' করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন এবং আসিবার সময়ও 'রাম রাম' বলিতে বলিতে চলিয়া আসিতেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "কৃষ্ণকিশোর রাম নামে সিদ্ধ।"

মথুরানাথ আর জানবাজারে গমন না করিয়া একাদিক্রমে দক্ষিণেশ্বরেই ছয় বৎসর অবস্থিতি করেন এবং দিবানিশি রামকৃষ্ণদেবের নিকটে থাকিয়া ঈশ্বরীয় কথা শুনিতেন ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার কোষ্ঠীতে লিখিত ছিল যে তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহার সঙ্গেই থাকিবেন। মথুরানাথ এই কথা স্মরণ করিয়া আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার ইষ্টদেবতা এবং সেই ধারণা দৃঢ়ীভূত করিয়া রামকৃষ্ণসেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

একদিন মথুর তাঁহার পরম আরাধ্য রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নানা প্রকার ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিতেছেন, মথুরনাথ মনের সন্দেহ মিটাইয়া নানা প্রশ্ন করিতেছেন এবং রামকৃষ্ণদেব তাহার উত্তর দিতেছেন; এমন সময় মথুরানাথ কহিলেন, "মশাই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান বটে তবুও স্বকৃত নিয়ম কানুনের বাধ্য হয়ে তাঁহাকেও চলতে হয়। তিনি কখনও সে নিয়ম ভাঙ্গতে পারেন না। এই দেখুন সাদা জবাফুলের গাছে সাদা জবাই হয়, লাল জবা ত হয় না?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ভগবান্ কোন নিয়মে বদ্ধ নন। তাঁর ইচ্ছা হয় ত এই সাদা জবার গাছেই লাল জবা হ'তে পারে।"

পর দিন মথুরানাথ পূর্ব্ববৎ রামকৃষ্ণ দেবের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমন সময় রামকৃষ্ণদেব মথুরকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইলেন যে সেই শ্বেত জবার গাছে একটী বৃন্তে দুইটী জবা একটী শ্বেত আর একটী লাল। মথুরানাথ পরীক্ষা

করিবার জন্য পুষ্পদ্বয়কে তুলিয়া দেখিলেন যে সত্য সত্যই একটী বৃন্তে দুইটী দুই রকমের ফুল। মথুর ইহা দেখিয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তিনি এইরূপে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে থাকিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, এক দিবস রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মথুর তুমি যত দিন এখানে থাক্‌বে আমিও তত দিন থাক্‌ব।"

মথুর যেন শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "সেকি বাবা! দোয়ারিও যে তোমাকে ভক্তি করে?"

রামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা তবে দোয়ারি যত দিন এখানে থাক্‌বে, আমিও তত দিন থাক্‌ব।" প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিযাছিল। মথুরানাথের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার উল্লিখিত পুত্রের জীবদ্দশা পর্য্যন্তই রামকৃষ্ণদেব সেই দেবালয়ে ছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবেরে ভাবোন্মত্ততা যথার্থ পক্ষে দ্বাদশবর্ষব্যাপী। তিনি নিজ বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, "বার বৎসর ধ'রে ভেতরে একটা সাধনার ঝড় বয়েছিল। দিন রাত যে কোথা দিয়ে যেত তার কিছুই ঠিক্ ছিল না। এই বার বৎসর ঘুম হয় নি।" এই দ্বাদশ বর্ষ তাঁহার চক্ষের পাতা পড়িত না, এবং তিনি চেষ্টা করিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলিতেন, "লোকের একটা ভাব সাধন কত্তে জীবন কেটে যায়, আর এই শরীরে উনিশটা ভাব সাধন হয়েছে।" ভক্তিশাস্ত্রে মহাভাবের অন্তর্গত উনিশটি ভাবের কথা উল্লিখিত আছে এবং উক্ত মহাভাব শ্রীরাধিকা ভিন্ন একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবেই প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবেই উহা বর্ত্তমান যুগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শুচি অশুচি ভেদ দূর করিবার জন্য তিনি এক সময়ে দিন কয়েক রজনী প্রভাতের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাইখানা পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানটী আপন মস্তকের দীর্ঘ কেশ দ্বারা মুছিয়া দিতেন, আর মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মা তুই আমায় দীনের দীন ক'রে দে মা, আমার অভিমান নাশ ক'রে দে মা।"

এই সময়ে পুত্রশোকার্ত্তা চন্দ্রাদেবী স্বদেশে আর অবস্থিতি করিতে না পারিয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে ঘরে বাস করিতেন তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে যে নহবৎখানা আছে তাহাতেই অবস্থিতি করিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের জননী আপনার পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে করিতেন, "বুঝি বা পরীতে পেয়েছে" এবং সেই জন্য নানা দেবতার নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিতেন? রামকৃষ্ণদেবেরও এই সময়ে আপনার দেহের প্রতি এতই অল্প দৃষ্টি ছিল যে মধ্যে মধ্যে আত্ম পূজার সময় আপন মস্তকে যে সমস্ত অর্ঘ্য ও শস্যাদি দিতেন তাহার কতকগুলি কেশের মধ্যে থাকিয়া যাইত। যখনই মনে হইত আপনি যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, কেশ মুছিতেন না; কেশমধ্যস্থ সেই সমস্ত শস্যাদির উপর পলি পড়িয়া শস্যগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত। সময়ে সময়ে আপনার মনে ভাগীরথী তীরে বসিয়া "মা আমায় দীনের দীন করে দে মা," বলিয়া রোদন করিতেন এবং সেই সময় তাঁহার এতই অশ্রুপাত হইত যে যেস্থানে বসিয়া থাকিতেন সেই স্থানটির মাটী ভিজিয়া যাইত।

কিছু দিন গঙ্গার তীরে যাইয়া এক হস্তে মৃত্তিকা ও অপর হস্তে কয়েকটা টাকা লইয়া আপনার মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেন, "এর নাম টাকা, এতে ধান চাল কাপড় হয়। এর নাম মাটী, এতেও ধান চাল কাপড় চোপড় সব হয়। এতেও যা হয় ওতেও তাই হয়। এও যা, ওও তাই।" তৎপরে 'টাকা মাটী, মাটী টাকা' বার কয়েক বলিয়া দুইটাই জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি এইরূপে কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া অবধি কোন ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেন না; এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার হস্তে ধাতু স্পর্শ করাইলে ঐ স্থানের মাংসপেশী সমূহ কুঞ্চিত ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া শরীরে কষ্ট উৎপাদন করিত এবং কখন কখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন।

এক দিবস কালী মন্দিরের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেব, হৃদয় ও মথুরানাথ বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বামাকণ্ঠের গান শ্রবণ গোচর হইল। ক্রমে সেই স্বর যেন নিকটে আসিতে লাগিল। মন্দির প্রাঙ্গণে সেই গান স্পষ্ট শুনা গেলেই রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইলেন। একজন স্ত্রীলোক একখানি বারাণসী সাটী ও নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, মাখন প্রভৃতি নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পূর্ণ একখানি থালি হস্তে লইয়া, এবং কতকগুলি রমণী পরিবেষ্টিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতে গাহিতে ধীর পাদবিক্ষেপে আগমন করিতেছেন। রমণী যশোদার ভাবে বিভোরা, লোচনদ্বয় আরক্তিম, প্রাণের গোপালের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, একটি মাত্র পাদবিক্ষেপ করিতেছেন আবার স্থির হইয়া মধুর উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছেন,—"দ্বারে দাঁড়ায়ে আছে তোর মা নন্দরাণী। গোপাল আয়রে তোরে নিতে আসিনে বাপ্, কেবল দেখে যাব চাঁদ

বদনখানি," আর তাঁহার নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। এক পদ অগ্রসর হইতেছেন আবার স্থির হইয়া গাহিতেছেন। এইরূপে ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। হৃদয় ক্ষিপ্রহস্তে মিষ্টান্নের থালাখানি ধরিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিলে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে শিশুর ন্যায় 'মা মা' বলিতে বলিতে রমণীর ক্রোড়ে উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বুঝিলেন রমণী আর কেহ নহেন সেই ভৈরবী মহাবিদুষী ব্রাহ্মণী। হৃদয় সেই থালা হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া প্রথমে রামকৃষ্ণদেবের মুখে দিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা শিশুর মত খাইতে লাগিলেন। তৎপরে হৃদয় সেই প্রসাদ উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিলেন। মথুরানাথ এই সমস্ত অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্য হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী যশোদার ভাব, এবং রামকৃষ্ণদেব তাঁহার গোপাল ভাব সম্বরণ করিলেন। ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অলঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিধবার বেশ ধারণ করিলেন।

তন্ত্র সাধনার শেষ হইলে রামকৃষ্ণদেব স্ত্রী ভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। বাল্যকালে যখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিতেন তখন তাঁহার হাব ভাব পাদক্ষেপ অঙ্গ পরিচালনা ইত্যাদি সকল কার্য্যেই স্ত্রীভাব জাজ্বল্যমান থাকিত। এখনও নানা প্রকার অলঙ্কারাদি পরিয়া স্ত্রীবেশে মা কালীর বা রাধাকান্তের সখীভাবে যখন অবস্থিতি করিতেন তখনও তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সকলের ভ্রম জন্মিত। মথুরানাথ এই সময়ে যত্ন সহকারে নানাবিধ স্বর্ণ অলঙ্কার পরাইয়া এবং বহুবিধ উত্তম উত্তম বস্ত্র ও কাঁচলি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিতেন। এইরূপ সুসজ্জিত স্ত্রীবেশে কখন মা কালীর পার্শ্বে কখন

বা রাধাকৃষ্ণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামর ব্যজন এবং সখীর মত নৃত্য গীত করিতেন।

মথুরানাথ প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার সময় রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে লইয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে তবে প্রতিমার চক্ষুদান করা হইত। মথুরানাথ প্রতি বৎসরই এই নিয়মে পূজা করাইতেন। স্ত্রীভাবে সাধনার সময় সপ্তমী পূজার দিবস রামকৃষ্ণদেব জান বাজারে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর দালানে যাইবা মাত্র তাঁহার ভাবাবস্থা আসিল এবং সেই ভাবাবেশে তিনি দুর্গার নৈবেদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। পুরোহিতগণ এবং অন্যান্য সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ভটচায্যি মশাই সব নষ্ট কল্লে, পূজার নৈবিদ্যি সব নষ্ট কল্লে"। একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হইল; মথুরানাথের নিকট সংবাদ গেল। তিনি এই কথা শুনিবামাত্র মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন; দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব ভাবে বাহ্য হারা হইয়া নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন। মথুর পুরোহিতগণকে ভক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন "আজ ঠিক মার পূজা হল, মা স্বয়ং নৈবিদ্যি গ্রহণ কল্লেন; তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা ঐ সব নৈবিদ্যিই মা দুর্গাকে নিবেদন ক'রে দেও।" তাহার পর রামকৃষ্ণদেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মা সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছেন।" মথুরানাথের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; অবশেষে তাঁহারই কথা মত সেই সমস্ত নৈবেদ্যই মা দুর্গাকে নিবেদিত হইল।

সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণদেব মথুরকে কহিলেন, "মথুর আমাকে সখি সাজিয়ে দেও।" অমনি মথুরানাথের স্ত্রী পাঁচ ছয় জন পরিচারিণীর সাহায্যে তাঁহাকে বারাণসী সাটী সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার

ও উত্তম ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। তৎপরে রামকৃষ্ণদেব যে স্থান হইতে স্ত্রীলোকেরা প্রতিমা দর্শন করেন সেই স্থানে যাইয়া চামর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিমাকে চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার চামর করিবার অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলেই অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ইনি কাদের বাড়ীর মেয়ে? এরূপ ভাব ত কখন দেখিনি! যেন সাক্ষাৎ মাদুর্গার সখী।" হৃদয়ানন্দ এই সময়ে পূজা দেখিবার জন্য জানবাজারে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ তাঁহাকে গোপনে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে উপস্থিত স্ত্রীলোকগণকে দেখাইয়া কহিলেন, "হৃদয়, এঁদের মধ্যে থেকে তোমার মামাকে খুঁজে নাও দেখি?" হৃদয় অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য এ সকল কথা হৃদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব যত দিন জানবাজারে ছিলেন প্রত্যহই বৈকালে চারিটার সময় মথুরানাথের জায়া তাঁহাকে স্বহস্তে এইরূপে সাজাইতেন এবং মথুর নিকটে থাকিয়া বলিতেন, "দেখ, ইনি জগৎ পাবন, প্রাণ ভ'রে সেবা ক'রে নেও," আর আপনিও আনন্দ সাগরে মগ্ন হইতেন।

মথুরানাথ মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে লইয়া রাখিতেন, তখন অনন্তকর্ম্মা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিতেন। উত্তম গোলাপজল উত্তম উত্তম নানাবিধ সুগন্ধি তৈল, অত্যুৎকৃষ্ট আতর, নানাবিধ ফুলের মালা দিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। সাধারণতঃ লোককে নিত্য দেবসেবা বা ইষ্টপূজার জন্য সাধারণ দ্রব্যাদিরই বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায়। কিন্তু মথুরানাথ সর্ব্বোৎ-

কৃষ্ট দ্রব্যাদি দিয়া আপন ইষ্টদেবতার সেবা করিতেন ; আর অন্তরালে হৃদয়কে সজল নয়নে বলিতেন, "হৃদু, আমার স্ত্রী, পুত্র, বিষয় আশয়, সবই মিথ্যে ; কেবল রামকৃষ্ণই সত্যি" ! তাঁহার যথার্থই এই ধারণা ছিল এই জন্য মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে জানবাজারে আনিয়া প্রাণের সম্পূর্ণ আশ মিটাইয়া সেবা করিতেন।

রামকৃষ্ণদেব এক বৎসর কাল স্ত্রীভাবে সাধন করিবার পরে কিছুকাল বলরামের ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেন ; আবার কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বলরামকে ডাকিতেন। তাহার পর কিছুদিন শ্রীমতীর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেন। এই সমস্ত বিভিন্নভাবে যখন ভগবানকে ডাকিতেন তখন অবিরল নয়নধারায় মাটী ভিজিয়া কর্দ্দম হইত এবং সমাধিস্থ হইয়া দেহ পুলকে পূর্ণিত হইত। একদিন এমন পুলক হইয়াছিল যে আপাদ মস্তক লোমকূপগুলি কাঁটালের কাঁটার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রতি লোমকূপ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অভিমান ত্যাগ করিবার জন্য পাইখানা পরিষ্কার করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া রামকৃষ্ণদেব কাঙ্গালিদের উচ্ছিষ্ট শালপাতা মাথায় করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতেন ও প্রার্থনা করিতেন, "মা আমার অভিমান ঘুচিয়ে দে মা।" এবং অভিমান ও ক্রোধের উদয় হয় কি না দেখিবার জন্য আপনাকে নানা অবস্থায় ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেন।

মথুরানাথ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া রামকৃষ্ণদেবের সেবা করিতেন। তাঁহার মনে বড়ই প্রবল বাসনা ছিল যে তিনি মহামূল্য রত্নাদি দ্বারা তাঁহার পরমারাধ্য ইষ্ট দেবতাকে সর্ব্বদা সুসজ্জিত রাখেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু কোন বিষয় ভ্রূক্ষেপ করেন না। মথুর একখানি

উত্তম কাপড় তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন, কিছুক্ষণ পরে তিনি উলঙ্গ হইয়া সেই কাপড়খানি হয়ত কাহাকেও দান করিলেন। একদিন মথুরানাথ একখানি বহুমূল্য শাল ক্রয় করিয়া স্বহস্তে রামকৃষ্ণদেবকে পরাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাহা পরিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এর নাম শাল, শাল গায়ে দিলে লোকে বড় মানুষ মনে করে, আর মনে অভিমান হয়, 'আমি এমন শাল পরেছি'; শাল গায়ে দিলে ত ভগবান লাভ হয় না, উল্‌টে অহঙ্কার বাড়ে, তবে এমন শালে আমার কাজ কি?" এই বলিয়া শালখানি খুলিয়া মাটিতে পাতিয়া তাহার উপর পাদচারণ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ভাবোন্মত্ত হইয়া সেই শালকে মহা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই প্রকার করিয়া পরে তাহার উপর থুৎকার দিয়া পলায়ন করিলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরানাথকে জানাইলেন যে, তাঁহার সোণার থালে আহার করিবার অতিশয় বাসনা হইয়াছে। মথুরানাথ তখনি একজন স্বর্ণকার ডাকাইয়া একপ্রস্থ সোণার থালা বাটী গেলাস প্রভৃতি তৎপর প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। স্বর্ণকার দুই চারি দিবস পরে সেই সমস্ত বাসন প্রস্তুত করিয়া আনিলে প্রভুদেব বালকের মত মহানন্দে তাহাতে আহার করিতে বসিলেন; কিন্তু আহার করিতে করিতে তাঁহার ভাবাবস্থা আসিল—তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। হৃদয় তাঁহার মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া আহার করাইয়া দিলেন। এই একবার মাত্র ব্যবহার করিয়াই তিনি সেই সমস্ত বাসন ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার সাধন অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন মতের সিদ্ধ পুরুষগণ তাঁহার নিকট আসিতেন, এবং ভাল ভাল সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব

পরমহংস বাউল সাঁই দরবেশ যে কত আসিতেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহার সাধনার প্রায় শেষ অবস্থায় তোতাপুরী নামক এক জন উলঙ্গ পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। ইনি সাত শত নাগার প্রধান ছিলেন এবং হৃষীকেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিতেন। পৌষ মাসে গঙ্গাসাগরে স্নান করিবার জন্য আসিয়া পথে রাণীরাসমণির দক্ষিণেশ্বরস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে তিন দিবস মাত্র অবস্থিতি করিয়া যাইবেন, এই মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম কুছ সাধন করোগ ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হামারা মাই কহেগা তো শিখেগা।" তোতা মনে করিলেন, বালক আপন গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলিলেন, "তব্ যাও তোমারা মাইকো পুছো।" রামকৃষ্ণদেবও সরল বালকের ন্যায় "আচ্ছা" বলিয়া দ্রুতপদে কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি মা কালীর আজ্ঞাবহ সন্তান, যখন যে কার্য্য করেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তবে করেন। এ কথাও মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা বলিলেন তবে, "হ্যাঁ শেখ"।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শেখাবাবে মা ?"

কালী উত্তর করিলেন, "ওই তোকে বেদান্ত শেখার জন্যে এসেছে। ওরি কাছে শেখ্।"

রামকৃষ্ণ কালী মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাবস্থ হইয়া এইরূপ প্রশ্নোত্তর আপনাপনি করিয়া তৎপরে তোতাপুরীর নিকট পুনরাগমন করিলেন এবং কহিলেন, "হাঁ হামরা মাই বোলা হ্যায়, তোমারা পাশ বেদান্ত শিখেগা, তুম্ শিখাও।"

তোতাপুরী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাহাতে রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসী হইলে কি করিতে হইবে? তোতা তদুত্তরে কহিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ হোমাদি করিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব তাহা সমস্তই স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু কহিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া অন্যত্রে যাইতে পারিবেন না। তোতা কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন যে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী জীবিতা আছেন, সন্ন্যাসী হইতে দেখিলে তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইবেন, কারণ তাঁহার আর কোন পুত্র জীবিত নাই। তোতাপুরী ইহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং বেদান্তের উপদেশ মত 'নেতি নেতি' বিচার করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ ধ্যানের প্রথমাবস্থায় তিনি যে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতেন, এই সময় ধ্যানে বসিয়া তৎসমুদয় নেতি নেতি বিচার পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া তাহার অতীত অবস্থায় গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচার ও ধ্যান করিতে করিতে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাস লইবার তিন দিন পরেই তাঁহার উক্ত অবস্থা হয়। রামকৃষ্ণদেব কেবল মাত্র তিন দিবস বেদান্ত মতে বিচার ও সাধনা করিয়াই নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ এবং ব্রহ্মে অবস্থিত আছেন দেখিয়া তোতাপুরী অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "চল্লিশ বরস সাধনা কর কে হামারা যোন্ অওস্থা নেহি মিলা হ্যায় তিন রোজ সাধনা করকে ইন্‌কো ওহি অওস্থা হুয়া! ইএ ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়!! এই ক্যা দৈবী মায়া হ্যায়!!"

পরে এক দিবস তোতাপুরী রামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন যে প্রত্যহ

ধ্যান করা আবশ্যক, এবং উপমা দিলেন যে একটী ঘটি প্রত্যহ না মাজিলে অপরিষ্কার হইয়া আইসে। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যদি সুবর্ণ ঘটি হয় ত তাহা না মাজিলেও সে কখন অপরিষ্কার হয় না।" তোতাপুরী স্বয়ং প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান করিতেন এবং সর্ব্বদা সম্মুখে একটী ধুনী জ্বালাইয়া রাখিতেন। সেই ধুনীটীকে এতই পবিত্র জ্ঞান করিতেন যে, কোন গৃহস্থ কিংবা অন্য কোন লোককে তাহা স্পর্শ করিতে দিতেন না। এক দিবস ধুনীর নিকটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভারী আসিয়া সেই ধূনী হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিল। তোতাপুরী তদ্দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া ভারীকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব এই সময়ে পঞ্চবটীতে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন; তিনি তোতাপুরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "দূর শালা, তোর এই ব্রহ্মজ্ঞান? এখনো এত ভেদবুদ্ধি?"

তোতাপুরী এই কথা শ্রবণ মাত্র চমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহা অপরাধীর ন্যায় রামকৃষ্ণদেবের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "হাঁ তোম্ ঠিক্ বাতায়া, ভাই ঠিক্ বাতায়া, মেরা কসুর হুয়া হায়! আজ্ সে আওর ক্রোধ নেই করুনা।" তোতাপুরী রামকৃষ্ণদেবের নিকট এই-রূপে আপন অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে শিষ্যের মত না দেখিয়া আপন গুরুভাইয়ের মত দেখিতেন ও তাঁহার সহিত সেই মত ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাকে "পরমহংসজী" বলিয়া ডাকি-তেন। তোতাপুরীর কথামত এই সময় হইতে রামকৃষ্ণদেবকে সকলে 'পরমহংস' বলিয়া ডাকিতেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে তোতাপুরীর অত্যন্ত পেটের পীড়া উপস্থিত হইল; যন্ত্রণায় অস্থির, কোন উপায়েই যন্ত্রণা নিবারণ হয় না,

বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া ক্রমে এরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তোতা রাত্রিকালে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছায় জলে নামিতে লাগিলেন। যতদূর গমন করেন তাঁহার জানুর উপর আর জল উঠে না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, যন্ত্রণার উপশম কিছুতেই হইল না; এমন সময় রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক, বলিলেন, "তুম্ হামারা মাইকো বাশ্ প্রার্থনা করো শান্তি হোগা।"

তোতাপুরী সাকার দেবদেবী মানিতেন না তথাপি নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে আশু অব্যাহতি পাইবার আশায় অগত্যা মা কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন। যে দিন প্রার্থনা করিলেন, সেই দিবসেই যন্ত্রণা দূর হইল। তোতাপুরী আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, সমস্ত দেবদেবী মানিতে লাগিলেন।

তোতাপুরী একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়া তাঁহাকে 'ন্যাংটা' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। রামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্ত বিচারে ও ঈশ্বরীয় নানাপ্রসঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত ঐশীশক্তি এবং সর্ব্বাবস্থায় সমভাবেই সেই এক পরমানন্দের ভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া তোতাপুরী তিন দিবসের স্থলে এগার মাস কাল তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

হৃদয় বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে স্বয়ং এই কথা বলিতেন, "ন্যাংটা ট্যাংটাকে যে গুরু করে ছিলুম, সেটা কেবল বেদ বিধির প্রমাণ আর তার মান্য রাখবার জন্যে। সাধনার সময়ে আমার ভেতর থেকে ঠিক আমার মত এক সন্ন্যাসী বালক মূর্ত্তি বার হোয়ে আমাকে উপদেশ করত। আর যতক্ষণ না সেই মূর্ত্তি আবার শরীরে ঢুক্‌তো ততক্ষণ বাহ্যজ্ঞান হত না।"

তিনি যাঁহাদিগকে গুরু করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে তাঁহাকে আপনাদের গুরুভাবে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার এরূপ উজ্জ্বল আভাযুক্ত কান্তি এবং এমন শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইয়া থাকিত, এবং হৃদয় বলেন এই সময়ে যিনি যাহা মনে করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেন, তাঁহার সেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইত। এমন কি সেই সময়ে কোন উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি রামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রোগী আরোগ্য লাভ করিত। রামকৃষ্ণদেব এই ভাব গোপন করিবার জন্য সর্ব্বদা একখানি ঘনবস্ত্রের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিতেন। অবশেষে তিনি মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা এভাব চেপে দে মা, এভাব চেপে দে।" এইরূপ প্রার্থনা করিবার কিছু পরে তাঁহার ঐভাব বিলুপ্ত হয়।

বিষয়ী লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করা তাঁহার পক্ষে এই সময়ে অতীব কষ্টকর হইয়া উঠে, এবং ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির সন্ধান পাইলে স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন শুনিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি। ইহা শুনিয়া মথুরানাথকে কহিলেন যে, একবার দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন। মথুরানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থায় দুই জনে বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন এবং সেই জন্য পরস্পর আলাপও ছিল। মথুরানাথ একদিন রামকৃষ্ণদেব ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া দেবেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব কটিদেশে বস্ত্রাদি রাখিতে পারিতেন না, একজন্য কেবল মাত্র একখানি মোটা চাদরে আবৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রকোষ্ঠে মথুরানাথ প্রবেশ করিলেন, রামকৃষ্ণদেব সেই প্রকোষ্ঠের সম্মুখের দালানে হৃদয়ের সঙ্গে পদচারণ

করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ যাইয়া দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার আগমন সম্বাদ দিলেন। তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে লইয়া উপবেশন করাইলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি উপবিষ্ট হইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং তৎপরে ক্রমে সহজাবস্থা আসিলে কহিলেন, "তুমি দেখছি, কলিকালের জনক। সংসারে থেকে ভগবানে মন রাখতে পেরেছ।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় তাঁহাকে পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা তুমি গায়ের কাপড় খোল, আমি দেখব।" দেবেন্দ্রনাথের পরিধানে একখানি বস্ত্র ও গাত্রে একটী পিরান ছিল। দেবেন্দ্রনাথ পিরান খুলিলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন, "তুমি কিছু ঈশ্বরীয় কথা বল।"

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই সংসারটা যেন গ্যাসের ঝাড় আর জীব যেন তারি এক একটী বাতি জ্বলছে।"এই কথা শুনিয়া প্রভুদেব পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধি ভঙ্গের পর কহিলেন, "ঠিক বটে, তাই বটে। কিন্তু তুমি কি বুঝলে বল।"

দেবেন্দ্রনাথ কহিলেন, 'সেই এক ব্রহ্ম হতেই এই জগতের উৎপত্তি। গ্যাস যেমন দূর গ্যাস ঘর থেকে সকল বাতির মধ্যে এসে জ্বলছে, তেমনি প্রত্যেক জীবের ভেতর তিনিই চৈতন্য রূপে বিরাজ করছেন।" এই কথা শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণদেব পুনরায় ভাবস্থ হইলেন। এইরূপ আরও ঈশ্বর প্রসঙ্গের পর তথা হইতে বিদায় লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমাদের সমাজের উৎসবে আপনাকে আসতে হবে।"

রামকৃষ্ণদেব। "সে যার ইচ্ছা।" বলিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ মথুরানাথকে কহিলেন, "দেখ, সেদিন অনেক ভদ্রলোক আস্‌বেন। তুমি ওঁকে কাপড় চোপড় পরিয়ে এন।"

মথুরানাথ কহিলেন, "সে ওঁর ইচ্ছা। আমার কথায় কিছুই হবে না।"

মথুরানাথ তাঁহার ইষ্টদেবতাকে গাড়ীতে উঠাইয়া বলিলেন, "বাবা, দেবেন্দ্রের বড় ইচ্ছে যে তুমি তাদের উৎসবে একবার যাও।" কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না! পরদিন দেবেন্দ্রনাথ পত্রদ্বারা মথুরকে জানাইলেন যে, পরমহংসদেব যদি বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক সভ্য হইয়া আইসেন ত ভাল নতুবা তাঁহাকে আনিবার আবশ্যক নাই।

রামকৃষ্ণদেবের এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম সাধন করিবার ইচ্ছা হইলে গোবিন্দ চন্দ্র রায় নামক জনৈক দরবেশ সাধক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহারই নিকট 'আল্লা মন্ত্র' গ্রহণ করিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কাছা খুলিয়া 'আল্লা আল্লা' স্মরণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং এই ভাবে তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। এই তিন দিবস কালী বা অন্য কোন হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, বা কোন হিন্দুদেবদেবীর নামোচ্চারণ করিতেও পারিতেন না। মন্দিরগুলির উত্তরে রাণীর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যে অট্টালিকা আছে, তথায় যে সকল হিন্দু দেবদেবীর ছবি ছিল, সে সমস্ত স্থানান্তরিত করিয়া তন্মধ্যে এই কয় দিবস বাস করিলেন। আল্লা মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই মুসলমানের দ্বারা রন্ধন করাইয়া আহার করিবার জন্য একান্ত

ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "সে কি বাবা! মোছলমানের হাতে কি খেতে আছে, নিন্দে হবে যে! আমি একজন ভাল মোছলমান রসুয়ে এনে দিচ্ছি। সে দেখিয়ে দেবে, আর একজন ভাল ব্রাহ্মণ রসুয়ে রাঁধবে। তাই খাওনা কেন?" বালকস্বভাব রামকৃষ্ণদেব অমনি কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ তাই হবে।"

রামকৃষ্ণদেব এই তিন দিবস সর্ব্বদা কাছা খুলিয়া 'আল্লা' 'আল্লা' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইতেন এবং তদবস্থায় পয়গম্বর মহম্মদকে দর্শন করিতেন। এক দিবস মস্‌জিদে যাইয়া নামাজ করিবার প্রবল বাসনা হইলে তিনি ক্রমে ভাবস্থ হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া তথায় নামাজ পড়িতে লাগিলেন; এদিকে হৃদয় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অবশেষে সেই মস্‌জিদে যাইয়া দেখিলেন তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নামাজ করিতেছেন। হৃদয়ানন্দ তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র তিনি বালকের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন।

রামকুমারের পুত্র অক্ষয় বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত রামভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাক্‌সিদ্ধ পিতা যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন যে অক্ষয়ের আয়ু অল্প এবং বলিতেন, "ও বাঁচবে না", আর পাছে অত্যন্ত মায়ায় প'ড়ে কষ্ট পে'তে হয় সেই জন্য শৈশবকালে অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিতেন না। হলধারী প্রায় দ্বাদশ বৎসর রাণী রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করিয়া পরলোক গমন করিলে অক্ষয় রাধাকান্ত জীউর পূজায় ব্রতী হইলেন। এই সময় অক্ষয়ের বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র। তিনি রাধাকান্তের সেবা করিয়া পঞ্চবটীতলায় ১০৮ শিব পূজা করিতেন এবং সেই স্থানেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া

আহার করিতেন। রাধাকান্তের পূজা করিবার সময় এরূপ ধ্যানমগ্ন হইতেন যে কেহ শব্দ করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহার সংজ্ঞা হইত না।

অক্ষয় কার্য্যে অবসর পাইলেই অন্য কোন কার্য্য না করিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। এক দিবস বিষ্ণুমন্দিরের সমক্ষে বসিয়া তদ্রূপ পাঠ করিতেছেন ও রামকৃষ্ণদেব তথায় বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ম্ময় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত জ্যোতিঃ আসিয়া ভাগবতে পড়িয়া তৎপরে রামকৃষ্ণদেবের বক্ষে আসিয়া তিন বস্তুকে একত্র সম্বদ্ধ করিল। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ এই তিনই এক বস্তু বা একেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

অক্ষয়ের বয়ঃক্রম এখন আন্দাজ সপ্তদশ বা অষ্টাদশের অধিক নহে। তাঁহার পিতৃব্য বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী কুঁচেকোল নামক গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের লক্ষণাদি ধরিয়া রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে বিবাহটী শুভ নহে। অক্ষয় বিবাহের কিছুকাল পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া পীড়িত হইলেন। পীড়া পৃষ্ঠব্রণ! তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়াই পিতৃব্য রামেশ্বরকে পত্র লিখিলেন! রামেশ্বর সেই পত্র পাইবামাত্র রামকৃষ্ণদেবকে অক্ষয়ের অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব অতি কাতর স্বরে কহিলেন, "হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ! কোন রাক্ষসী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! ছোঁড়া মারা যাবে দেখ্‌ছি!"

হৃদয় বলিলেন, "হ্যাঃ! তোমার এক কথা। আচ্ছা; ও রকম কথা তুমি কেন কও, বল দেখি? বিয়ের বিষয় কেউ জিজ্ঞেস ক'রে

তাতে উত্তর কর্‌তে পার না। ছোঁড়াটার স্বভাব বিগ্‌ড়ে যাচ্ছিল ব'লে, দেখে শুনে বিয়ে দেওয়া গেল। এখন বল কি না রাক্ষসীর সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে, ছোঁড়া বুঝি বাঁচবে না।"

রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি করুণ স্বরে কহিলেন, "হৃদু, আমি কি বলি, মা যে আমায় বলান, আমি কি ইচ্ছে করে বলি? আমায় মা যা জানিয়ে দেন আমি তাই বলি!"

যাহা হউক রামেশ্বর যাইয়া ডুলি করিয়া অক্ষয়কে কামার পুকুরে আনয়ন করিলেন। অক্ষয় তথায় কিছুদিন থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া পরে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। এখানে অতি অল্প দিনের মধ্যে বেশ সুস্থ হইলেন। তৎপরে হঠাৎ এক দিবস সামান্য তাহার জ্বর হইল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "না হৃদু গতিক বড় ভাল নয়। এক বৎসর যেতে না যেতে পৃষ্ঠব্রণ, তাও ভাল হ'য়ে এখানে এসে বেশ চেহারা ফিরেছিল কিন্তু আবার জ্বর; এ ভাল গতিক দেখচিনি হৃদু।" ষষ্ঠ দিবসে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। হৃদয় রামকৃষ্ণ-দেবকে লইয়া গিয়া দেখাইলেন। তিনি অক্ষয়কে সম্বোধন করিলেন,

"অক্ষয়"!

"আজ্ঞা"।

"তুই ভুল বক্‌চিস্‌ কেন"?

"কৈ ভুল বক্‌চি"? অক্ষয় এই কথা বলিয়া থু থু করিয়া ঊর্দ্ধে থুৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, "হৃদু, ডাক্তারগুলোর আট্‌কাল নেই, রোগ চিন্‌তে পারে নি। এ পুরো বিকার হয়েছে। যদি তুই আশ মিটিয়ে চিকিচ্ছে কত্তে চাস্‌ ত একজন ভাল ডাক্তার এনে দেখা। তোর যাকে ইচ্ছে এনে

দেখা, নইলে শেষে আপশোষ কর্‌বি? কিন্তু আমি বল্‌ছি এ বাঁচ্‌বে না।"

হৃদয় মহা আগ্রহের সহিত কহিল, "ছি, ছি! মামা, এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে কেন বেরোয়?"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "হ্যাঁ রে, আমার কি ইচ্ছে? আমি যে দেখ্‌ছি মা যে আমায় জানিয়ে দিচ্ছেন।"

যাহা হউক হৃদয় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইবার অতি উত্তম তদ্বির করিয়াও অক্ষয়কে বাঁচাইতে পারিলেন না। বিংশতি দিবসে অক্ষয় মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইল। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, "অক্ষয়, বল গঙ্গা, নারায়ণ, রাম।"

অক্ষয় "গঙ্গানারায়ণ ওঁ রাম" তিনবার বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন "হৃদু, ওর সদ্গতি হবে।"

অক্ষয় কেবল তিন বৎসর মাত্র পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহার পরলোক গমনের পর রামেশ্বর বিষ্ণুপূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বৎসর মাত্র পূজা করিয়াও তিনিও পরলোক গমন করেন।

একদিন মথুরানাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, "রামকৃষ্ণদেব যথার্থ কামজিৎ হয়েছেন কি না পরীক্ষা কর্‌তে হবে।" এই ভাবিয়া গুপ্তভাবে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক অনেকগুলি সুন্দরী বারবনিতাকে একটী বাটীতে আনাইয়া তাহাদের বলিলেন, "দেখ তোমাদের একটা কাজ কর্‌তে হবে। আমি একজন লোককে আজ এখানে নিয়ে আস্‌বো। আর তোমরা তাঁকে নানা রকম হাব ভাব দেখিয়ে তাঁর কামভাব জাগিয়ে দেবে।" তাহারা সকলেই সম্মত হইলে মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে

'চলুন্ বাবা বেড়িয়ে আসি', বলিয়া কলিকাতায় লইয়া চলিলেন, হৃদুও সঙ্গে চলিলেন। গাড়ী আসিয়া সেই বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল। মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যে ঘরে বারবনিতাগণ তাঁহার জন্য বসিয়াছিল সেই ঘরে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া, হৃদয়কে লইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। বেশ্যারা নানাবিধ বেশভূষা করিয়া অর্দ্ধ-বিবসনা হইয়া বসিয়াছিল। রামকৃষ্ণদেব ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; পরে 'মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী', বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন. অমনি তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কটিদেশ হইতে খসিয়া পড়িল এবং তিনি দিগম্বর বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বারবনিতারা তাঁহার এই ভাব দেখিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত রহিল। পরে পরস্পর কহিতে লাগিল, "এঁর ত দেখ্‌ছি কাম্ ফাম্ কিছুই নেই!"

কেহ বলিল, "ইনি যে দেখছি মহাপুরুষ!"

অন্য একজন বলিল, "আমরা বেশ্যাবিত্তি কার বটে, কিন্তু এঁকে দেখে আমাদের মনে বাৎসল্যভাবের উদয় হচ্চে, আজ আমাদের মহাভাগ্যি যে এ রকম মহাপুরুষ দর্শন হ'ল।"

আবার একজন কহিল, "দিদি, বহু জন্মের পুণ্যি না থাক্‌লে এমন মহাপুরুষের দর্শন হয় না।"

এইরূপ নানা কথা সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "হ্যাঁ দিদি কি সর্ব্বনাশই করেছি ভাই, আজ আমরা এই মহাপুরুষকে লোভ দেখাতে গিছলুম। আমরা ত ভাই মহা অপরাধ করেছি!" অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাই, তাই ত এ মহাপুরুষের সঙ্গে চঙ করতে

গিয়ে মহা অপরাধই হয়েছে, এখন যে সর্ব্বনাশ হবে, তার উপায় ?” এই বলিয়া সকলে অতীব ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মথুরানাথ ও হৃদয় বারাঙ্গনাদের কোলাহল শুনিয়া তথায় আসিলেন এবং তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বারাঙ্গনাগণ তখন যাহার কথায় এইরূপ মহাপুরুষের নিকট অপরাধী হইয়াছে, সেই মথুরকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, “এখন আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবে তার উপায় কি ?” রামকৃষ্ণদেব এই সময় সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া প্রস্থানের জন্য দণ্ডায়মান হইলে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া দিলেন, তৎপরে তিনজনে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে মথুরানাথ প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবকে আপনার ফিটনে লইয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। একদিবস মথুর তাঁহাকে জানবাজারে লইয়া যাইবার জন্য ফিটেন করিয়া যাইতেছেন, পথে বরাহনগরের নিকট এক সংকীর্ত্তনের দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবের সেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নৃত্য করিতে অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা হইল। গাড়ী সংকীর্ত্তনের দলকে ভেদ না করিয়া তাঁহার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় হইতে রজ্জুবৎ ঘনীভূত জ্যোতিঃ বাহির হইয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার অনুরূপ একটি মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই দলের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল, আর কীর্ত্তনও খুব জমিয়া গেল। এইরূপে সেই মূর্ত্তি সেই কীর্ত্তনে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া পুনরায় তাঁহার দেহে আসিয়া প্রবেশ করিলে তৎপরে তাঁহার সহজাবস্থা আসিল। মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে এতই যত্ন করিতেন যে যখন

তাঁহাকে লইয়া জানবাজারে রাখিতেন তখন সমস্ত বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার পরিচর্য্যাই করিতেন এবং রাত্রিতে তাঁহাকে অন্দরে আপন শয়নকক্ষে উত্তম পর্য্যঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া তাঁহার নিকটে অন্য এক পর্য্যঙ্কে আপনি শয়ন করিতেন। এই সময় এক অনুপলের জন্যও মথুর তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না।

মথুরানাথ কিছুদিন পরে একটী স্ফোটকের যন্ত্রণায় শয্যাগত—জানবাজারে আছেন; রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হওয়াতে তিনি তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই লোককে কহিলেন, "গিয়ে কি কর্‌ব? আমি কি তার ফোড়া আরাম করতে পারব?" তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন না; লোকটি যাইয়া মথুরকে ঐ কথা জ্ঞাপন করিল। মথুর আরও ব্যাকুল হইয়া তাহাকে পুনরায় তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। নিতান্ত ব্যাকুলতা বুঝিয়া রামকৃষ্ণদেব জানবাজারে গমন করিলেন। মথুর তাঁহাকে দর্শন করিয়াই পরম আনন্দে কহিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূল দাও।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "পায়ের ধূল নিয়ে কি হবে? তোমার ফোড়া আরাম হবে কি?"

মথুর কহিলেন, "বাবা, ফোড়ার জন্যে ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্যে তোমার পায়ের ধূল চাইছি।"

মথুরের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তিনি সমাধিস্থ হইলেন; এবং মথুরানাথ হামাগুড়ি দিয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া অবধি রামকৃষ্ণদেব আর কোন প্রকার ধাতু

স্পর্শ করিতে পারিতেন না ; তাঁহার হস্ত কোন প্রকার ধাতুর সংস্পর্শে আসিলেই অমনি কুঞ্চিত হইয়া শরীরে যন্ত্রণা উপস্থিত হইত এবং কখন কখন সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইয়া নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইত। সেই জন্য হৃদয় তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছায়ার মত থাকিয়া সর্ব্বদা সেবা করিতেন। একদিন হৃদয় তাঁহাকে মা কালীর প্রসাদ খাওয়াইয়া তাঁহার মুখ ধৌত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিতে কহিলেন। তৎপরে স্বয়ং আহার করিতে বসিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে আপন প্রকোষ্ঠে না গিয়া গঙ্গার তীরে যাইতে লাগিলেন। দেবালয়ের একজন দাসী রামকৃষ্ণদেবকে মাতালের ন্যায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দৌড়িয়া হৃদয়কে কহিল, "ওগো পরমহংস বুঝি গঙ্গায় প'ড়ে যান। শিগ্‌গির দৌড়ে যাও, দৌড়ে যাও, বেহুঁস হ'য়ে গঙ্গার দিকে যাচ্ছেন। হৃদয় তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ দিকের পোস্তার ধারে এক পদ আছে, অপর পদ ভাগীরথী গর্ভে পড়িতেছে! হৃদয় তাঁহাকে একেবারে দুই হস্তে বেড়িয়া নিজ বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন।

কলিকাতা পাথরিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য যদুনাথ মল্লিক রামকৃষ্ণ দেবকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন ; তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট আসিতেন এবং নিভৃতে তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে মহানন্দ ভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে অতি যত্ন সহকারে আপনার দক্ষিণেশ্বরস্থ উদ্যানে লইয়া যাইতেন। এক দিবস রামকৃষ্ণদেব উক্ত মল্লিকের উদ্যানের একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে যিশুখ্রীষ্টের একখানি প্রতিকৃতি দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তদবস্থায় জ্যোতির্ম্ময় যিশু মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই মূর্ত্তি ক্রমেই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং পরিশেষে তাঁহার ভিতরে

প্রবেশ করিল, এবং প্রবেশ মাত্র সমস্ত হিন্দুভাব তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত ও তৎপরিবর্ত্তে কৃশ্চানী ভাবের উদয় হইল এবং তিনি তাহা নিবারণ করিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন, "মা, এ আবার কি ক'রে দিলি মা, এ আবার কি করে দিলি?" ইহার পর তিন দিবসাবধি তাঁহার এই ভাব বর্ত্তমান ছিল, এবং তিনি সেই অবস্থায় ভাবাবিষ্ট হইয়া গির্জ্জা ও পাদ্রিগণকে দর্শন করিতেন। একদিন গির্জ্জায় যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে সিন্দুরিয়াপটীর শম্ভুচরণ মল্লিকের নিকট কিছুদিন বাইবেলের যিশুতত্ত্ব শ্রবণ করিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের সাধনার শেষ হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী নিজ পিত্রালয় জয়রাম বাটীতে রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার পিতা কন্যাকে স্বামী সমীপে রাখিয়া উত্তম চিকিৎসা করাইবার জন্য সঙ্গে পাল্কী করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ঝড় জলে মহা দুর্য্যোগ উপস্থিত করিল। পাল্কীর বেহারাদের সঙ্গে কড়ার ছিল অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া তাহারা স্বস্থানে চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই দুর্য্যোগে সারদাদেবীর পিতা বহু অন্বেষণ করিয়া পাল্কীর স্থলে একখানি মাত্র ডুলি পাইলেন। অগত্যা রুগ্ন কন্যাকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় আট দশ দিনের পর যখন তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় একটা বা ততোধিক।

দুই এক দিনের মধ্যেই মথুরানাথ মাতাঠাকুরাণীর চিকিৎসার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রায় এক বৎসর কাল চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় মা যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম

পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ। মাতার এই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন। রামকৃষ্ণদেবের সাধনাদিও ঠিক সেই সময়ে সমাপ্ত হইলে, তিনি তঁাহার পত্নীর চরণে ষোড়শীর পূজা করিয়া সকল সাধনার উদ্যাপন করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু হৃদয়ের নিকট তাঁহার এই মনোভাব গোপন রাখিয়া অন্য একজন লোক দ্বারা জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথি শ্যামার ফলাহারী পূজার দিন সমস্ত উদ্যোগ করাইলেন। সন্ধ্যার আরাত্রিকের পরে হৃদয় শ্যামার মন্দিরে পূজায় নিযুক্ত হইলে সেই সময় নিজ প্রকোষ্ঠে মাতাঠাকুরাণীকে আনাইলেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে পূজার উপকরণাদি সাজাইয়া দিলে প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রামকৃষ্ণদেব পত্নীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া আপনি পূজায় বসিলেন, অমনি জগন্মাতা জগৎপতি সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া অপূর্ব্ব ভাবে মগ্না ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইলেন। রামকৃষ্ণদেব যতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিলেন তিনি প্রতিমাস্বরূপ সেই ভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। রামকৃষ্ণদেব পূজান্তে তাঁহার জপ করিবার রুদ্রাক্ষের মালাটি লইয়া শ্রীশ্রীচরণে পুষ্প অঞ্জলি দিয়া পূজা সমাপ্ত করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাতা তাঁহার পিতার সহিত পুনরায় জয়রাম বাটী প্রত্যাগমন করিলেন*।

ইহার পর কিছুকাল অতীত হইলে একদিন মা শুনিলেন তাঁহাদের গ্রামের পার্শ্বস্থ কয়েকটি গ্রামের স্ত্রীলোকেরা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতে স্নান করিতে যাইবেন। শুনিয়া তৎসঙ্গে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা হইল। পিতা মাতার আদেশ লইয়া মা তাঁহার মনোভাব গ্রামের প্রবীণাদের নিকট জানাইলেন, তাঁহারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সকলে দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা

* আমরা মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি।

করিলেন। কোনও কালে পথ চলা অভ্যাস নাই, তাহার উপর স্বভাবতঃ মাতা অতিশয় কোমল ও ক্ষীণাঙ্গিনী, কাজেই কিছুদূর যাইতে না যাইতেই ক্লান্তিবোধ করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে এক চটিতে আসিলে সেইখানে সকলে রন্ধনাদি করিয়া আহার করিলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার সকলে একত্রে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার পর অপর এক চটিতে আসিয়া সকলে কিছু জলযোগ করিয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্রথম দিনের পথশ্রমে মাতার চরণে এতই বেদনা হইয়াছিল যে চলিতে তাঁহার দারুণ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিয়দ্দুর অতি কষ্টে সঙ্গিনীদের সহিত চলিয়া পিছাইয়া পড়িনে লাগিলেন। ক্রমে দুই চারি পদ চলিয়া পায়ে যন্ত্রনায় বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। অপর কোন স্ত্রীলোক এতদবস্থায় সঙ্গিনীদের কাহাকেও ডাকিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিত ; কিন্তু মাতা স্বভাবতঃ এতই নম্র ও সলজ্জ যে রামকৃষ্ণদেবের দ্বিতীয় ভ্রাতা রামেশ্বরের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকেও তাঁহার কষ্টের কথা বলিতে পারেন নাই। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রৌদ্রে শ্রান্ত ক্লান্ত, ও যন্ত্রণায় মাতার চক্ষে জল আসিল ; যতদূর দেখা যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গিনীদের আর দেখিতে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, ভয়ে আকুল হইয়া বসিয়া মাতৃহারা বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ভয়ে বিভোর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন এমন সময় পশ্চাতে হঠাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে অদূরে দেখিলেন একজন দীর্ঘ বংশ দণ্ড হস্তে অতি বলিষ্ঠকায় কৃষ্ণবর্ণ মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি এক পুরুষ এবং তাহার পার্শ্বে রূপার গহনা পরা কৃষ্ণকায় এক স্ত্রীলোক তাঁহার দিকে আসিতেছে।

এই সমস্ত প্রান্তরে একেলা পাইলে ডাকাতে লুট করিবার জন্য প্রাণ-সংহার করে ; মাতা এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া, এবং বেলা প্রায় অবসান দেখিয়া অধিকতর ভীতা হইয়া রোদন করিতে করিতে ঐ পুরুষকে পিতা সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বাবা, আমায় রক্ষা কর। আমি চলতে পারিনি তাই সঙ্গীরা সব এগিয়ে চ'লে গেছে। আমি পায়ের যন্ত্রণায় এখানে বোসে পড়েছি।" যদিও মাতার বয়ঃক্রম তখন প্রায় সপ্তদশ বর্ষ তথাপি তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হইত তিনি দ্বাদশ বর্ষের অধিক নহেন। সরল বালিকার কাতর ভাব দেখিয়া ঐ স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ে স্নেহের কমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তাহারা তখনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং স্ত্রীলোকটি তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। মাতা সেই স্ত্রীলোকটিকে 'মা' 'মা' বলিয়া আপনার বৃত্তান্ত যথা সম্ভব সমস্তই কহিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকও তাহার নিজ পরিচয় দিয়া কহিল, "মা তোর কোন ভয় নেই। আমরা তোর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তবে ঘরে যাব। তোর কোন ভয় নেই মা। তুই নিশ্চিন্দি হ মা।"

এই স্ত্রী পুরুষ জাতিতে বাগ্দি, বোধ হয় কোন জমিদারের পাইক, কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিল,এখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। ঐ বাগ্দিনী মাতার স্নেহ সম্বোধনে তাঁহারপ্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে নিজগ্রামে না যাইয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইয়া তাঁহাকে স্বজনবর্গের সহিত মিলাইয়া দিয়া তৎপরে আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে অনেক আশ্বাস বাক্য কহিতে লাগিল। পরে তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে "এই মা কাছেই চটি আছে আস্তে আস্তে চল" বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক পান্থনিবাসে সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তথায় উপস্থিত হইয়াই আপনাদের বস্ত্র বিছাইয়া মাতাকে তদুপরি শয়ন করাইয়া বাগ্দিনী তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইল এবং স্বামীকে কহিল, "তুই বাছার জন্য কিছু কিনে আন্‌গে।" পল্লিগ্রামের পক্ষে বাগ্দি যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আহার্য্য পাইল আনিয়া মাতাকে দিল। মাও তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া শয়ন করিলেন; বাগ্‌দিনী তাঁহার নিকট কুটীরের মধ্যে শয়ন করিল; বাগ্দি দ্বারের নিকট বসিয়া লগুড় হস্তে দ্বারপাল হইয়া রাত্রি যাপন করিল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আবার দুই জনে মাকে লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলে মা একটু শ্রান্তিবোধ ককিলেই তাঁহাকে লইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিতে লাগিল। এই রূপে মধ্যাহ্ন কালে এক স্থলে উপস্থিত হইলে বাগ্‌দি যাহা কিছু উত্তম খাদ্য পাইল তাহা আনিয়া মাকে আহার করাইল এবং আপনারা কিছু জলযোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটীতে আসিয়া সঙ্গিনীদের নিকট উপস্থিত হইল। পরদিন গঙ্গাস্নান করা হইলে উক্ত স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্মীদেবীকে ও মাতাকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া পঁহুছিয়া দিল।

# প্রচার ও ভক্ত আহ্বান।

সাধনার শেষ হইয়াছে, এক দিবস রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে দেখিলেন, মা কালী আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তোর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আস্‌বে।" তিনি এই সংবাদ পাইয়া মথুরানাথকে বলিলেন, "মথুর, মা বল্‌লেন, তোর অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আসবে।"

মথুরানাথ এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কহিতেন, "কই বাবা, তোমার ভক্তেরা কবে আস্‌বে?"

এই কথায় রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিতেন, "তারা আস্‌বে। পরে আস্‌বে।" কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল অথচ কোন ভক্তের আগমন হইল না, ততই তিনি ভক্তগণকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনপ্রাণ উত্তরোত্তর এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, সন্ধ্যার সময়ে ভাগীরথীতীরে যাইয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন। শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যার আরাত্রিকের সময় মন্দিরের উত্তর বৈঠকখানার ছাদের উপর উঠিয়া, "ওরে তোরা কোথা আছিস্, শীগ্‌গির আয়রে, তোদের জন্যে যে বুক ফেটে যায় রে! ওরে তোদের দেখবার জন্যে যে প্রাণ যায় রে! তোরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির আয় রে!" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ভক্তগণকে আহ্বান করিতেন। ক্রমে তাঁহার ভক্তদর্শনের ব্যাকুলতা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কখন

সেই ছাদের উপর কখন বা ভাগীরথীতীরে ঐরূপ চীৎকার করিতে করিতে ছট্‌ফট্‌ করিতেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য কহিতেন, "বাবা, তোমার আর অন্য ভক্তের দরকার কি? আমি যে তোমার একাই একশ। তুমি আমায় বলনা, কি ক'রতে হবে।" কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সেই ব্যাকুলতা দূর হইত না।

কিছুকাল এই ভাবে চলিয়া তাঁহার „ব্যাকুলতার কিছু উপশম হইয়া আসিলে এক দিবস মথুরকে কহিলেন যে, তাঁহার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে, একজন ভাল পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবেন। হৃদয় ও মথুরানাথ কহিলেন যে. বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ইঁদেশনিবাসী গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তর্কভূষণ একজন উত্তম পণ্ডিত, তাঁহাকে আনাইলে ভাল হইবে। রামকৃষ্ণ তাহাতেই সম্মত হচলেন এবং এক-খানি পত্র লিখাইয়া হৃদয়ানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরতন মুখোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া তাহাকে ইঁদেশ পাঠাইলেন।

গৌরীকান্ত একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার একটী বিশেষ শক্তি ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করেন, এমন কেহই ছিলেন না। তিনি পত্র পাইবার কয়েক দিবস পরে দক্ষিণে-শ্বরে আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখন বৈঠকখানা বাটীতে আছেন। গৌরীকান্ত তথায় উপস্থিত হইয়াই "হা রে-রে-রে—নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণং" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র সিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন এবং গৌরী অপেক্ষা চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া ঐ সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক লাফাইতে লাফাইতে তাঁহার নিকটে উপ-স্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুজনের এইরূপ অদ্ভুত চীৎকারে

সমস্ত উদ্যানসহ দেবালয় যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল। রামকৃষ্ণদেবকে ঐ প্রকার চীৎকার করিতে এবং লাফাইতে দেখিয়া গৌরীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। রামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া স্থির হইলে গৌরী তাঁহার পদানত হইয়া করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! আজ আমি দিব্য জ্ঞান পেলুম। আপনি আমায় কৃপা করুন। আমি সাধন ক'রে অতি উচ্চ অবস্থা পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু, প্রভো, আমার পতন হয়েছে! আপনি জগৎ গুরু, আপনি কৃপা না করলে আর আমার গতি নাই।" রামকৃষ্ণদেব সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং নানারূপ ঈশ্বরপ্রসঙ্গে দুইজনে আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আপনার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গৌরীকান্ত তাঁহাকে শাস্ত্রমত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর রামকৃষ্ণদেব তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। তাঁহার তালু হইতে রুধিরস্রাব ইত্যাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়া গৌরীকান্ত কহিলেন, "লোকে পায়ে হেঁটে কাশী যাবার চেষ্টা করুছে, আর আপনি একেবারে কলের গাড়ী ক'রে সেখানে গিয়ে পৌঁচেছেন। আমরা শাস্ত্রে অবতারের যে সব লক্ষণ পাই, আপনাতে তা সবই প্রকাশ হয়েছে, তা ছাড়া আবার এত হয়েছে যে, শাস্ত্রে তার কিছুই পাওয়া যায় না আর আমরাও তার কিছুই বুঝিনি।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন. "আচ্ছা, তুমি এই কথা পণ্ডিতদের কাছে বল্‌তে পার?"

গৌরী কহিলেন, "আচ্ছা মথুর বাবু বড় বড় পণ্ডিত নিয়ে আসুন, দেখ্‌ব কে বিচার ক'রে আমার কথা কাট্‌তে পারে।" ইতিমধ্যে মথুরানাথ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "এর আর আশ্চর্য্য কি?

আমি সমস্ত বড় বড় পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে আনাচ্ছি।" রামকৃষ্ণদেব মথুরানাথকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "না, লোকে বল্‌বে, নিজের দেশের পণ্ডিতকে শিখিয়ে রেখেছে।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে হৃদয় রামকৃষ্ণদেবকে অন্তরালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, তোমরা দুজনে ও রকম বিট্‌কেল চীৎকার করলে কেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ওরে, গৌরী ঐ রকম চীৎকার করলে তার ভেতর একটা মহাশক্তির উদয় হয়। আমি তাই ওর মত চীৎকার ক'রে সেই শক্তিটা টেনে নিলুম।" এই বলিয়া তিনি হৃদয়কে বুঝাইয়া কহিলেন যে সন্তানোৎপাদন করিয়া গৌরীর পতন হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি তাঁহার শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

গৌরীকান্ত দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এমন সময়ে একদিন মথুরানাথ কলিকাতা নিবাসী পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীকে তথায় আনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে সম্বাদ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে পানিহাটীর মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণদেবকে ভগবান্ ভাবে সেবা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র ভাবাবেশে লম্ফ দিয়া তাঁহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিলেন; বৈষ্ণবচরণ তখনি রচনা করিয়া তাঁহাকে অবতার ভাবে দেবভাষায় স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব শেষ হইলে রামকৃষ্ণদেব নামিয়া বৈষ্ণবচরণের সম্মুখে উপবেশন করিয়া গৌরীকান্তকে বৈষ্ণবচরণের সহিত বিচার করিতে আহ্বান করিলেন। গৌরীকান্ত এই সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্তই অবলোকন করিয়াছিলেন, সুতরাং কহিলেন, "এঁর সঙ্গে আর বিচার কি করব, ইনি ত দেখছি আমার মতেরি লোক।"

এক দিবস হৃদয় ও মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবের নিকট বসিয়া

কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের কথা উঠিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে বঙ্গদেশের মধ্যে বেদান্ত এবং ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন, "বাবা, তুমি হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে আর যত লোক জন দরকার হয় নিয়ে বর্দ্ধমানে যাও, আমি সমস্ত খরচ দেব।"

রামকৃষ্ণদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া মা কালীকে কহিতে লাগিলেন, "মা, তুই আমার মা থাকৃতে বর্দ্ধমানে কি করতে যাব? তুই মা তাকে এইখানে এনে দে।" বারম্বার এই কথা বলিয়া বালকের মত আবদার করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া তৎপরে কহিলেন, "দশ দিন পরে আস্‌বেক, যেতে হবে না।" তিনি সকল সমস্যার বিষয় এই প্রকারে ভাবাবিষ্ট হইয়া সেবক ভাবে মা কালীকে প্রশ্ন করিতেন আবার তৎপরক্ষণেই স্বয়ং মা কালী ভাবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উত্তর করিতেন। রামকৃষ্ণদেব যখন এইরূপ কহিলেন, তখন হৃদয় ও মথুরানাথ ভাবিলেন যে, বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত এইখানে দশ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবেন সুতরাং তাঁহাকে আর তথায় যাইতে হইবে না।

পদ্মলোচন কাশীধামে বহুকাল ধরিয়া ন্যায় এবং বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের চর্চ্চা বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না। এই জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকে সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই একদিবস মথুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে রামকৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিয়া

কহিলেন, "বাবা, তোমার সেই বর্দ্ধমানের পণ্ডিত কল্‌কেতায় এসেছে। রাজা রাধাকান্তদেবের সঙ্গে তাকে কথাবার্ত্তা কইতে দেখিছি।" রামকৃষ্ণদেব এই সম্বাদ পাইয়া হৃদয়কে কহিলেন, "হৃদু, পদ্মলোচন কোথায় থাকে সন্ধান করতে পারিস্?" হৃদয় দুই এক দিনের মধ্যে সন্ধান পাইলেন যে, পদ্মলোচন দোকালীন জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন, আঁড়িয়াদহে বিমলাচরণ বিশ্বাসের উদ্যানে আছেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হৃদু, তুই প্রথমে যা, গিয়ে তাকে দেখে আয়। যদি অহঙ্কারী না হয়, আর ভাল লোক হয়, তা হলে যাব।" হৃদয় পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব মথুরকে তাঁহার হৃদয়ের কহিলেন, "হৃদু দেখে এলেই আমার অর্দ্ধেক দেখা হয়।" যথার্থই উপর এতই কৃপা ছিল যে, কাহারও সহিত প্রথম আলাপ করিতে হইলে তিনি অগ্রে হৃদয়কে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

হৃদয় পদ্মলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কি হৃদু, কেমন দেখলি?"

হৃদয় কহিলেন, "বেশ লোক মামা, খুব ভাল লোক ব'লে বোধ হ'ল মামা।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই কেমন ক'রে বুঝ্‌লি?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "মামা, সে ভাল লোক না হ'লে, আমি সামান্য লোক, আমায় এত খাতির যত্ন ক'রবে কেন? আমায় পান খাওয়ালে, কতক্ষণ ধ'রে সদালাপ করলে, তারপর আমি যখন তোমার কথা বল্‌লুম, খুব আগ্রহ ক'রে শুন্‌লে।" এই বলিয়া পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবর্ত্তা হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহি-

লেন, এবং রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার জন্য পদ্মলোচন যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলেন। রামকৃষ্ণদেব এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হৃদয় পর দিবস বৈকালে একখানি নৌকা করিয়া রামকৃষ্ণদেবকে পদ্মলোচনের নিকট লইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইয়াই পদ্মলোচন যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন, একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পদ্মলোচন আলুথালু বেশে শয়ন করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ কি আশ্চর্য্যরূপ দেখ্‌লাম, বাইরে মানুষের মত আকার আর ভেতরে কালী রূপ!" এই বলিয়া করজোড়ে তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণদেব উপবেশন করিয়া ভাবস্থ হইলেন, এবং কহিলেন, "তোমারি নাম পদ্মলোচন?"

পদ্মলোচন কহিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমারি নাম পদ্মলোচন।"

রামকৃষ্ণদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি খুব পণ্ডিত?"

পদ্মলোচন বলিলেন, "আপনি যখন পণ্ডিত বল্‌ছেন, তখন পণ্ডিত।"

তৎপরে সেই ভাবাবস্থায় রামকৃষ্ণদেব গান ধরিলেন;—

কে জানে গো কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে, হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন ॥

তৎপরে সেই ভাবের অবস্থাতেই পুনরায় গাহিলেন,—

বল দেখি ভাই কি হয় মলে, এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি ;
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে ;
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করেছে পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে।
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥

তিনি এইরূপ উপর্য্যুপরি আর দুই তিনটী গান করিলেন ; ভাবে টলমল, অপূর্ব্ব স্বরে গাহিতেছেন। পদ্মলোচন স্থিরদৃষ্টে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছেন, আর অবিরল নয়ন ধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। গান শেষ হইল ; পদ্মলোচন চক্ষু মুছিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য মশাই, আমার জীবনে কখনো চোকে জল আসে না। আজ এঁর গান শুনে আমার চোকে জল এল !" এই বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় গদগদ স্বরে কহিলেন, "আজ এঁর দর্শন পেয়ে আমার জীবন সার্থক হল। আমার শাস্ত্র পড়া এত দিনে ফলবতী হল।" পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি ছাত্র ছিল, তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমারা দেখলে ? আমার একঘর পুঁথি পড়ে যা হয়েছে, কিছু না পড়ে তার কত কোটীগুণ বেশী এঁর হয়েছে !"

রামকৃষ্ণদেব সেই ভাবের অবস্থাতেই কহিলেন, "হ্যাঁ রে হ্যাঁ।" তৎপরে বালকের মত জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁগা, এটা কি হয় বলতে পার ?"

পদ্মলোচন কহিলেন, "এটা দেবতার দুর্লভ রত্ন, সমাধি।"

হৃদয় কহিলেন, "অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা এঁকে অবতার বলেন। কিন্তু সে কথা যাক্ ; মশাই কি বলেন ?"

পদ্মলোচন এই প্রশ্নে যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, "অবতার ! এঁর যদি কৃপা হয় ত অনেকে অবতার হতে পারেন !"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি রাজার সভাপণ্ডিত, তুমি যে আমাকে এত মান্য করছ ?"

পদ্মলোচন উত্তর করিলেন, "আপনার পায়ের ধূল পেলে কত শত মহামূর্খ আমার চেয়ে পণ্ডিত হতে পারে।" পণ্ডিত মহাশয় ক্রমে আরও উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অবতার ত সামান্য কথা ; যাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে অবতারের উৎপত্তি হয়, আপনি স্বয়ং তিনি ! আচ্ছা, আমি আপনাকে যা বল্লুম তা কারুর সাধ্য থাকে খণ্ডন করুক, আমি শাস্ত্রমতে তর্ক করতে প্রস্তুত আছি।"

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিলেন, "আমি এদেশে এসে কল্‌কেতায় পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের পিতা উৎসবানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে লিখে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বিচার করেছি, সে সমস্ত আপনাকে পড়ে শোনাব ; আপনি শুনলে আমার সে সব বিচার করা সার্থক হবে !"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি রাসমণির বাগানে যাবে ?"

পদ্মলোচন একজন অতিশয় আচারী ব্যক্তি, কিন্তু পরমার্থ লাভের

জন্য সে সমস্ত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না জানিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রশ্ন করিলেন। পদ্মলোচন তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "কেন যাব না? আপনি হাড়ী মুচির বাড়ীতে থাকলে, আমি ত আমি, আমার চোদ্দ পুরুষ সেখানে যাবে! রাসমণি আর মথুর বাবু ত মহা ভাগ্যবান্; আপনি সাক্ষাৎ মা কালী, আপনাকে যখন অত যত্ন করে তাঁরা রেখেছেন, তখন রাসমণিও ধন্য, মথুর বাবুও ধন্য। আমি একটু ভাল হলেই যাব, জানবাজারে মথুর বাবুর বৈটকখানায় যাব। যেখানে যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন, মথুর বাবুকে দিয়ে নেমন্তন্ন করে আনাব, আর আপনাকে নিয়ে বিচার করব, দেখব আমার কথা কে খণ্ডন করতে পারে।"

পদ্মলোচন তাঁহার পুত্রকে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আনন্দ করিতেন। স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উপায় নাই, কারণ রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "মশাই, ধর্ম্মকর্ম্ম সব মুখে দাঁড়িয়েছে। সব কেবল মুখস্থ বিদ্যে, আর কূট তর্ক, আর দলাদলি। ইনি বলেন আমার বিষ্ণু বড়, উনি বলেন আমার শিব বড়! সেদিন বর্দ্ধমানে ত একটা মহাসভা করে বড় বড় পণ্ডিতরা বিচার করতে বসলেন—বিষ্ণু বড় না শিব বড়। কোন পণ্ডিত শিবকে খুব বড় করলেন; আবার আর একজন বিষ্ণুকে খুব বাড়ালেন। শেষ বিচারে কিছুই মীমাংসা হল না। ক্রমে পণ্ডিতদের ঝগড়া কচ্‌কচিই বাড়তে লাগল। মশাই, লোকগুলো এতই অসার যে, যা অনুভূতির বস্তু, আর আধেরে একই জিনিষ, তার আস্বাদ উপলব্ধির চেষ্টা ছেড়ে, এ বলে আমার দেবতা বড় ও বলে আমার দেবতা বড় আর ঝগড়া। শেষে আমায় ধরে টানাটানি, বলে—মীমাংসা

কর? তা বল্লুম, আমার চোদ্দপুরুষে কখন শিবও দেখিনি, বিষ্ণুও দেখিনি। কে বড় কে ছোট কেমন করে বলি? তবে শাস্ত্রে যেমন আছে বল্‌তে পারি। শৈব শাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে; আর বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় করেছে। তা দুই বড়, কেউ ছোট নয়।" সভাস্থ পণ্ডিতগণ তখন পদ্মলোচনের মতই সমর্থন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন, পরে বলিলেন, "তোমার জ্ঞান হয়েছে।"

এই সময়ে মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একটী অন্নকূট করিয়া সহস্র সহস্র মণ ধান্য তিল ও সর্ব্বপ্রকার শস্য এবং বহুসংখ্যক অর্থ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তথায় সুপ্রসিদ্ধা কীর্ত্তনীয়া "সহচরীর" কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে সভাস্থলে মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং দাওয়ান-জিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "টাকা আন।"

দাওয়ানজি কহিলেন, "আজ্ঞা কত টাকা আনব?"

মথুরানাথ—"কত টাকা কি, এক তোড়া আন। এনে বাবার সামনে সাজিয়ে দাও।"

দাওয়ান এক সহস্র টাকা আনিয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিল। রামকৃষ্ণদেব যখনি গান অতি মধুর বিবেচনা করিলেন, অমনি বস্ত্র দ্বারা ঠেলিয়া এক থাক টাকা সহচরীকে দান করিলেন। এইরূপে সমস্ত অর্থ দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তদ্বিষয়ে গান শুনিয়া তাঁহার ভাল বোধ হইলে আর কিছু না থাকিলে তিনি গায়ককে অন্ততঃ আপনার পরিধেয় বস্ত্র উলঙ্গ হইয়া খুলিয়া পারিতোষিক দিতেন।

মথুরানাথ এই অন্নকূট উপলক্ষে পদ্মলোচনকে আনিবার জন্য

অত্যন্ত ইচ্ছুক হইলে রামকৃষ্ণদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, "পদ্মলোচন বড় আচারী, সে আস্‌বে না।" মথুরানাথ তথাপি হৃদয়কে কহিলেন, "ভাই হৃদু, এত বড় বড় পণ্ডিতরা সব আসবে, পদ্মলোচন আসবে না এবড় দুঃখ হবে। তুমি কোন ফিকিরেও যদি তাঁকে আন্‌তে পার ত পণ্ডিত মশাইকে আমি হাজার টাকা দান করি।" হৃদয় পদ্মলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা জানাইলেন। পদ্মলোচন উত্তর করিলেন, "না মশাই, আমায় দশ হাজার টাকা দি'লও আমি সেদিন তাঁর বাড়ী যেতে পারি না। বরং অন্য একদিন যাব।" কিন্তু তাঁহার সে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল, কিছুতেই উপশম হইল না দেখিয়া পদ্মলোচন কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইয়া কাশীধামে দেহত্যাগ করিবেন, এই মানসে একদিন বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যাদি তাঁহার পুত্রের হস্তে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন। পুত্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট সেই সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া প্রসাদ চাহিলে তিনি কহিলেন, প্রসাদ খেলে কি তোমার বাবার রোগ আরাম হবে?" পদ্মলোচনের পুত্র উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না সে জন্য নয়। বাবা আপনার ভেতর ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখতে পান। আপনাকে স্বয়ং ভগবান বলে জানেন, তাই আপনার প্রসাদ খেয়ে কাশীযাত্রা করবেন, এখানে ব্যারাম সারলো না।" পণ্ডিত মহাশয় কাশীধামে উপস্থিত হইয়া অচিরে পরলোক গমন করেন।

গোবিন্দ নামে একটি বালক, নিবাস বরাহনগর, জাতিতে তেলি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যতক্ষণ ভগবৎ কথা কহিতেন,

গোবিন্দ পুলকিত হইয়া শুনিতেন ও অবিরল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। এই বালককে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক দিবস গোবিন্দ কহিলেন, "আমার একটী বন্ধু আপনার কাছে আসিতে চায়। সে বড় ভাল ছেলে। তাকে আনব কি?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনুমতি দিলে গোবিন্দ তাঁহার বন্ধু গোপালকে লইয়া আসিলেন। ঈশ্বরীয় কথা শুনিলে গোপালের ভাব হইত, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দুই বালকের নিকটে থাকিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও তাহাদের দেখিলে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিস্থ হইতেন। তিনি হৃদয়কে বলিতেন যে, গোবিন্দের প্রহ্লাদের অংশে জন্ম আর গোপালের ধ্রুবের অংশে জন্ম। তাঁহারা কিছুদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট এইরূপ যাতায়াত করিলে পর এক দিবস গোপাল তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে বিদায় দিন, আমি আর এ সংসারে থাকৃব না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বলিস্ কিরে? তোর এই অল্প বয়েস, আর কিছুদিন থাক্‌না, তার পর যাস্?"

গোপাল কহিলেন, "না বাবা, আমি আর এ সংসারে থাকব না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার আস্‌বি ত?"

গোপাল বলিলেন, "আচ্ছা, আবার আস্‌ব।"

এই ঘটনার পর হইতে বালকদ্বয় আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেন না। কিছুদিন অতীত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হৃদয়কে তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। তাঁহাদের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত আছেন, এবং হৃদয়ও কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই; ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট উপবেশন করিলেন, "কিরে এতদিন কোথা ছিলি? গোপাল কোথা?"

গোবিন্দ কহিলেন, "গোপাল আপনার কাছে বিদায় নিয়ে তারপর চলে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন. "সেকি রে; সে চলে গেছে?" গোবিন্দ উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ!" গোবিন্দেরও এ সংসারে থাকিতে আর ভাল লাগিল না; সেও কিছুদিন পরে ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

এই সময়ে নানা সম্প্রদায়ের সাধকগণ, পণ্ডিতগণ ও অন্যান্য বহু লোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। জয়পুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী নামে একজন পণ্ডিত নবদ্বীপে পঁচিশ বৎসর ন্যায়শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তথায় অবস্থিতিকালে তিনি লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন—সেই সময়, সাধনার প্রথমাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক খণ্ড বংশ স্কন্ধে লইয়া বাহ্যহীন ভাবোন্মত্তাবস্থায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে বলিয়াছিলেন, "আহা একেবারে উন্মাদ!" কিন্তু রামকৃষ্ণদেব যে সাধারণ উন্মাদ নহেন, দেবোন্মাদ ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার ভবিষ্যদবস্থা কিরূপ হয়, জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইতেন। কখন কখন বা আসিয়া তাঁহার নিকট কিছুদিন অবস্থিতিও করিতেন, এবং যতবারই তাঁহাকে দর্শন করিতেন ততই অধিকতর বিমোহিত ও তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেন। নবদ্বীপে পাঠ শেষ হইলে জয়পুরের রাজার সভাপণ্ডিত হইবার জন্য তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শেষ দর্শন করিয়া যাইবেন মনে করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতির পর চাতু-

র্মাস্তের সময় উপস্থিত হইল। তিনি সেই খানেই চাতুর্মাস্য আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল সন্দেহ ছিল, সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তৎসমুদায়ের মীমাংসা করাইয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে মহা আনন্দ উপভোগ করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের বারুদখানার পাঞ্জাবী শিখ সিপাইগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু নানকের অবতার জ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন; এমন কি, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পথে গমন কালে তাঁহাকে গাড়ীতে দেখিলে সকলে তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। প্রতিদিন দৈনিক কার্য্য হইতে অবসর পাইলে তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, এবং যাঁহার যেমন সঙ্গতি তিনি প্রভুদেবের জন্য তদ্রূপ কিছু না কিছু আহার্য্যদ্রব্য আনিতেন। এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে বারুদখানায় লইয়া গিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক গুরু নানকের উপদেশবাক্যের চর্চ্চা করিতেন। এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের সহিত তথায় যাইবার সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার একটী উপদেশবাক্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া কিছু উপদেশও দিতে লাগিলেন। শিখগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং "ক্যায়া, গৃহী হোকে জ্ঞান বতাতা!" বলিয়া সকলে আপনাপন তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, তাঁহার ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বিষম বিপদ দেখিয়া দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিবারণ করিয়া বলিলেন "শাস্ত্রী মহাশয় অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার খাতিরে শাস্ত্রী মহাশয়কে মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।" এই কথায় তাঁহারা ক্ষান্ত

হইয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "গৃহীওঁকো ইয়ে চাল্ বড়া বুরা হায়। মগর্ তুম্ অ্যায়সা কাম আওর্ মত্ করো!" শাস্ত্রী মহাশয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল, তিনি কহিলেন, "জি নেহি!"

ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের সিপাহীরা আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতেন; এবং বারাকপুরের সিপাহীরা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বারাকপুরে লইয়া যাইতেন। এক দিবস তাঁহারা তাঁহাকে বারাকপুরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারে কিরূপে থাকিতে হয়?" এই প্রশ্ন শ্রবণ মাত্র তিনি কহিলেন, "মেয়েরা যেমন ঢেঁকীর গর্ত্তে হাত দিয়ে চিঁড়ে পাল্‌টে দেয়, অথচ সেই সঙ্গে একটী ছেলেকে মাই দেয়, আবার হয়ত একটী খোদ্দেরের সঙ্গে দর হিসেব করে, এতগুলো কাজ এক সঙ্গে করে, কিন্তু মনটা তার থাকে সেই ঢেঁকীর দিকে; তাই ঢেঁকীটা হাতের উপর পড়ে না। সেই রকম সংসারে থেকে ষোল আনা মনটী ভগবাণে দিয়ে রাখ্‌তে হয়, তাহলে আর কোন গোল থাকে না।"

মথুরানাথের পুত্র দ্বারিকানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। একদিন তিনি কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করাইতে আনিলেন। তিনি বৈঠক্‌খানায় উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে দিয়া সম্বাদ পাঠাইলেন, হৃদয় যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন যে মাইকেল তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বৈঠক্‌খানায় বসিয়া আছেন, রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হৃদু, তুই যা, আমি যাব না।" হৃদয় তাঁহার কথামত উক্ত কুটিতে আগমন করিলে, মাইকেল তাঁহাকে "আসতে আজ্ঞা হয়" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারিকানাথ কহিলেন, "ইনি পরমহংসদেব নন। ইনি তাঁর ভাগ্নে।" তৎপরে হৃদয়কে বলিলেন, "আপনি তাঁকে ডেকে আসুন" এবং দত্তজা

মহাশয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ইনি তাঁহাকে দর্শন করিতে এসেছেন।" তখন পুনরায় যাইয়া হৃদয় তাঁহাকে আনয়ন করিলে মাইকেল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করে আমায় কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বল্‌ব কি মুখ যেন কে চেপে ধর্‌ছে।"

মাইকেল কহিলেন, "আমি আপনাদের দাসকুলে জন্মেছিলুম, আমায় বল্‌বেন না কেন?"

প্রভুদেব কহিলেন, "তা নয়। আমি বলতে চাই কিন্তু আমার বুক যেন কে চেপে ধর্‌ছে, বল্‌তে দিচ্ছে না।"

মাইকেল প্রভুদেবের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "আমি বুঝিয়াছি আপনি আমায় কেন বলবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে কহিলেন, "শাস্ত্রীকে ডেকে আনত"। শাস্ত্রী মহাশয় তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া চাতুর্মাস্যের ব্রত পালন করিতেছিলেন। হৃদয় তাঁহার নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি সম্পূর্ণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া, শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে মাইকেলকে উপদেশ করিতে অনুমতি করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুমতি পাইয়া সংস্কৃত ভাষায় মাইকেলের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। দত্তজ মহাশয়ও তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিত লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষা অশুদ্ধ হওয়াতে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ভাষা অশুদ্ধ হচ্ছে কেন?

মাইকেল। "অনেক দিন চর্চ্চা নাই সেই জন্য।"

শাস্ত্রী। "আপনি কি হিন্দুধর্ম্ম মানেন না?"

মাইকেল। "মানি।"

শাস্ত্রী। "তবে কৃশ্চান্ হলেন কেন?"

মাইকেল। "আমি ধর্ম্মের জন্য কৃশ্চান্ হইনি। দায়ে পোড়ে কৃশ্চান্ হয়েছিলুম। কিন্তু এখন বেশ বুঝেছি সেটা ভুল করেছিলুম। আর এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, হিন্দু ধর্ম্মের মত আর ধর্ম্ম নেই।"*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথা শুনিয়া গান ধরিলেন, "বল দেখি ভাই কি হয় মলে," তৎপরে "সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। আপনার কর্ম্ম আপনি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥" মাইকেল গান শুনিয়া বলিলেন "আমাকেও তিনি এই রকম করেছেন, আমি কি করব?" তাহার পর তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী যাবেন?"

শাস্ত্রী কহিলেন, "আমি কারো বাড়ী যাই নি, আমার কোন প্রত্যাশা নাই, থাকলে যেতুম।" মাইকেল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গান দুইটাতেই প্রচুর উপদেশ পাইয়া পরম আহ্লাদিত চিত্তে বিদায় লইলেন।

শাস্ত্রীমহাশয় দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহার জয়পুরের সভাপণ্ডিত হইবার বাসনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, তিনি কাহাকেও মন্ত্র দেন না। শাস্ত্রীর আগ্রহ আরও বাড়িল, তিনি

* পাঠক বোধ হয় জ্ঞাত আছেন দত্তজ মহাশয়ের দায় এক বিষম দায় বটে; তিনি কোন কৃশ্চান্ মহিলার (মেমের) প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পিতা মাতার অমতে কৃশ্চান হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না।

মন্ত্র না লইয়া ছাড়িবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে মন্দিরে যাইয়া কালী দর্শন করিতে উপদেশ করিলেন। শাস্ত্রী কহিলেন, "এখানে চেতন কালী থাক্‌তে আমি পাষাণ কালী দেখ্‌তে যাবনা।" শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবই তাঁহার চেতন কালী।

কিছুদিন পরে চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে শাস্ত্রী মহাশয় মনের দুঃখে ভাগীরথীতীরে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া আছেন. এমন সময়ে তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় অমনি তাঁহার দুইটি চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর আমায় মন্ত্র দাও, আমায় দীক্ষা দিতেই হবে, আমি ছাড়ব না।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন "ঐ কালীমন্ত্র জপ কর, তাহলেই হবে।" শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পরে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রভুদেবকে বলিয়াছিলেন, "যদি বস্তু পাইত আবার আসব, নইলে আর আসবো না।" তৎপরে এক পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে হঠাৎ বিষম জ্বরগ্রস্ত হইয়া তথায় দেহত্যাগ করেন।

হৃদয়ের ইচ্ছা।—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত তাঁহারও ঐশী শক্তি জন্মে; ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার মাতুলের পদ্ধতিতে সাধনাদি করিলে ইহা হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই ভাবিয়া কখন কখন পৈতা ও কাপড় ফেলিয়া দিয়া ধ্যান করিতে বসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহা দেখিয়া একদিন কহিলেন, "হৃদু, তুই কেন ও রকম করিস্? ওরকম করিস্ নি। মাকালী আমায় ঐ অবস্থা করে দিয়েছিলেন, আমার বুদ্ধি উল্‌টে দিয়েছিলেন, তাই আমি ঐ রকম করতুম, নইলে আমি কি সাধ করে করতুম? তুই ওরকম করিস্‌নি, তুই কেবল আমার কাছে থাক্‌বি, সেবা করবি; তুই যে আমারি অংশ, সেবার জন্যে

এসেছিস্; নইলে কি সেবা করতে পারিস্, সাধ্যি কি? তুই যে আমার অংশ, তোর আর কিছু করতে হবে না।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে এইরূপে বুঝাইয়া তৎপরে মথুরানাথের নিকট বালকের ন্যায় সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। মথুরানাথ হৃদয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ! অমন যদি করবে, ত তোমার জান্ নেব! বাবার কাছে আমরা দুজনে নন্দীভৃঙ্গীর মত থাক্‌ব, আর সেবা কর্‌ব। খবদ্দার আর ওরকম কোরনা!" হৃদয় আড়ম্বর বা তাঁহার মাতুলের ক্রিয়া-কলাপের অনুরূপানুষ্ঠান না করিয়া মা কালীর পূজাতেই মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কহিতেন, "মামা, তোমার ঐশ্বর্য্য আমায় দেও। আমার বড় সাধ, একটী নবরত্ন কোরে তোমায় সেখানে রাখি, আর তোমার পূজা করি, ভোগ দি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "তুই ও সব করলে কি হবে? এর পর দেখবি, কত লোকে কত কি করবে। আর তুই কেবল দেখে দেখে বেড়াবি। তুই একলা করলে কি হবে? এর পর ঘরে ঘরে পূজা করবে।" ইহার কিছু পরে একদা নিশীথকালে শ্রীরামকৃষ্ণ শৌচে গমন করিতেছেন, হৃদয় গাড়ুটী লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। এমন সময়ে হৃদয় হঠাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শূন্যমার্গে যাইতেছেন, মানুষ নহেন সাক্ষাৎ পতিতপাবন ভগবান্, এবং দেখিলেন, রামকৃষ্ণ-দেবও যে বস্তু, তিনিও সেই বস্তু। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া হৃদয় চীৎ-কার করিতে লাগিলেন, "ও রামকেষ্ট, ও রামকেষ্ট, ওরে তুইও যে আমিও সেই। ওরে আমরা মানুষ নইরে—তবে আর কেন, চল্ দেশে দেশে যাই, জীব উদ্ধার করিগে।" হৃদয়ের বিকট চীৎকার শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ওরে অমন করে চ্যাচাস্নি, চুপ কর, লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে? চুপ কর্।" হৃদয় সে কথা অগ্রাহ্য

করিয়া আরও চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রুতপদে আনিয়া, তাঁহার বক্ষস্থলে হস্তস্পর্শ করিলেন, কহিলেন, "থাক্ থাক্, জড়্ হয়ে থাক্। একটু দেখেই এত, আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা এর চেয়ে কত বেশী দেখ্ছি। তোর এখনো সময় হয়নি, চুপ কর্ চ্যাচাস্নি।" অমনি হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নির্জীব হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, বলিলেন "মামা ,তুমি দিব্য চক্ষু দিলে, দিয়ে কেড়ে নিলে কেন ? তুমি জড় হতে বল্লে কেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বল্লুম। তুই এখন স্থির হয়ে থাক, সময়ে কত দেখবি, কত বুঝবি।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয়ের ভাবাবেশ হইতে লাগিল। ভাবে কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা নৃত্য করেন। একদিন শ্যামার পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঐরূপ হাস্য করিতেছেন এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। হৃদয়ের ভাব দেখিয়া মথুর কহিলেন, "বাবা এসব ত তোমারি খেলা, তাহা না হলে এত দিন ত হৃদুর ওসব কিছু হয় নি। সে দিন তোমার কাছে ও কেঁদেছেল, তাই তোমার কৃপা হয়েছে। আচ্ছা বাবা, ভাব হলে মনের ভিতর কি রকম হয় ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ও এবার আর ঢঙ করে নি। একতার হয়ে কচ্চে। তোমারও যখন হবে তখন বুঝতে পারবে। ঐ অবস্থা না হলে বোঝা যায় না। জলের মাছ জলে ছেড়ে দিলে তার যেমন হয়, সেই রকম হয়। তা তোমার যখন হবে তখন বুঝতে পারবে।" এই বলিয়া হৃদয়ের বক্ষে হস্ত দিয়া কহিতে লাগিলেন, "থাম্রে থাম্! আর ভাব দেখাতে হবে না। ভাব দেখিয়ে আমারি বড় সব হল, আবার তুমি ভাব দেখাচ্ছ। চেপে যা চেপে যা, ভাব চাপ্তে শেখ।"

হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিলেন, এবং তদবধি আর তাঁহার ঐরূপ ভাব না হইয়া শান্তভাবে দর্শনাদি হইত।

মথুরানাথ বিষয়কর্ম্মের জন্য মধ্যে মধ্যে জানবাজারে যাইয়া কিছু দিন থাকেন, আবার কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে জানবাজারে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারও ভাব হইতে লাগিল। তিনি আর বিষয়কর্ম্ম কিছুই করিতে পারেন না। কখন আপন মনে গান করেন, কখন আপনার ভাবে আপনি হাসেন, কখন বা উন্মত্ত হইয়া ধেই ধেই নৃত্য করেন। আবার কখন বা অতি করুণ স্বরে একেলা বসিয়া রোদন করেন। তাঁহার বাটীর সকলে তাঁহার হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইলেন। পুত্রের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও প্রতীকার ঘটিল না দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পিতার বায়ুরোগ হইয়াছে। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "না রে বাপু আমার মাথা খারাপ হয় নি, আমি পাগলও হৈ নি। তোরা বাবাকে এখানে আনতে পারিস্? ভাবিস্‌নি, বাবাকে এখানে নিয়ে আয়।" এই কথা শুনিয়া পুত্রেরা বুঝিলেন যে, তবে বায়ুরোগ হয় নাই. এবং ত্বরায় যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্বাদ দিলেন। তিনিও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ জানবাজারে উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে পর তিনি কহিলেন, "মথুর, তুমি ভাব কি রকম জান্‌তে চেয়েছিলে, তাই মা কালী তোমায় জানিয়ে দিলেন। এখন আর কেন? এর পর লোকে বল্‌বে আমি তোমাকে গুণ করিছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মথুর স্থির হইয়া, দম্ভ সহকারে কহিতে

লাগিলেন, "আমি কারুর কথা মানিনি।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে পুনরায় কহিলেন, "তবে বাবা, এসব তোমাতেই সাজে আর তোমাতেই থাক্। আমি ওসব চাই নি। আমি বিষয় কর্ম্ম করব আর প্রাণভরে তোমার সেবা করব।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "বেশ, তাই হবে।" তদবধি মথুরানাথের আর ভাব হইত না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তত্ত্বদর্শী হইতে লাগিলেন।

একদিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাগীরথীতীরস্থ উদ্যানে বসিয়া আছেন, নিকটে হৃদয়। ইতিমধ্যে মালাপাড়ার জনৈক প্রাচীন গোস্বামী, "মহাপুরুষ কোথায়, মহাপুরুষ কোথায়" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেখানে ছিলেন, সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে কহিলেন, "হৃদু, দৌড়ে যা ঐ দুর্গানন্দকে দেখিয়ে দিগে যা।" এই বলিয়া দ্রুতগমনে আপন প্রকোষ্ঠ হইতে একখানি মোটা বস্ত্র লইয়া আপনাকে আপাদ মস্তক আবরিয়া নাট মন্দিরের একটী স্তম্ভের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। দুর্গানন্দ নামে একজন ব্রহ্মচারী এই সময় পঞ্চবটীতে থাকিতেন। হৃদয় গোস্বামী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া সেই দুর্গানন্দের নিকট গেলেন। দুর্গানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গোস্বামী কহিলেন, "ইনি ত মহাপুরুষ নন, মহাপুরুষ কোথায়?" এই বলিয়া পুনরায় অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কালী-মন্দিরে উঠিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া মা কালীকে প্রণাম করিয়া নাট মন্দিরে আসিলেন ও সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত কে একজন বসিয়া আছেন দেখিয়া দ্রুত তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক আবরণ মুক্ত করিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, আর গোস্বামী তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার ঘরের পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ভাগীরথী দর্শন করিতেছেন, দূরে দুইজন মাজি পরস্পর কলহ করিতে করিতে গঙ্গার তীর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ঝগড়া করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে একজন আর একজনের কেশাকর্ষণ করিয়া পৃষ্ঠে সজোরে এমন চপেটাঘাত করিল যে, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া সেই প্রকার রোদন করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। হৃদয় শ্যামার মন্দির মধ্য হইতে তাঁহার রোদন শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠে পাঁচ অঙ্গুলির দাগ রক্তমুখী হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি মামা তোমায় কে মাল্লে মামা, কে মাল্লে মামা বল, আমি তার মাতাটা গুঁড়িয়ে ফেল্‌ব, কে মাল্লে বল।" কিয়ৎক্ষণ পরে একটু স্থির হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রকৃত ঘটনা বলিলেন। মাজি দুইজন বহুদূরে যায় নাই; হৃদয় দ্রুতপদে তাহাদের নিকট যাইয়া একজনের পৃষ্ঠে তদ্রূপ করাঘাতের দাগ দেখিয়া এবং তাহাদের মুখে তাহাদের ঝগড়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম এবং ভারতেতর দেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসমূহের সাধনা শেষ করিয়াছেন; বিভিন্ন মতের সাধনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সকল মতই ভগবৎসকাশে উপনীত হইবার এক এক পথ এবং তাহাদের বিরোধ কাল্পনিক মাত্র। এই অমানুষী সাধনসমূহের শেষাবস্থা হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। পেটের পীড়ায় তাঁহাকে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, নানাপ্রকার চিকিৎসায় রোগের কোনও উপশম হইতেছে না। তাৎকালিক কবিরাজশ্রেষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ সেন বহু দিন ধরিয়া

চিকিৎসা করিয়া অবশেষে সকল প্রকার আহার এবং জল পান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। হৃদয় তাঁহার পেটের পীড়ার প্রকোপ দেখিয়া মধ্যে মধ্যে কহিতেন, "বাবা! যেমন ভাবের বেগ তেম্নি রোগেরও ধমক্!" যাহা হউক কবিরাজ মহাশয়ের বাটী হইতে নির্গত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসিতে হাসিতে হৃদয়কে কহিলেন, "অ হৃদু, লোকটা বলে কি রে? আড়াই মাস জল বন্দ করে কেবল দুদ্ খেয়ে থাক্‌তে হবে?" তাঁহার এ চিকিৎসা মনঃপূত হইল না। হৃদয় পরামর্শ দিলেন, "মামা, দেশে যাবে? চলনা দেশে যাই। সেখানে গেলে দুচার দিনে পেটের ব্যায়রাম সব সেরে যাবে। চল দেশে যাই।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং দেশে যাইয়া আরোগ্য লাভ করিবার পরে তথা হইতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ তাঁহাদের এই পরামর্শ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং নানাবিধ বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আনাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন।

কামারপুকুরে আগমন করিলে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাঁহার পীড়ার বিশেষ উপশম হইল। হৃদয়ের বাটী সিহোড় গ্রামে, এবং কামারপুকুরের অতি নিকট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখন আপন বাটীতে কখন বা সিহোড়ে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে অবস্থিতি করেন, তখনি সেই খানে এক মহাজনতার আবির্ভাব হয়। অনেক দিন পরে স্বদেশে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া পরিচিত লোকের ত কথাই নাই, যাঁহারা তাঁহাকে কখনও দর্শন করেন নাই, কেবল তাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি যখন সিহোড়ে অবস্থিতি করিতেন,

হৃদয় মহা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক সকলকে আহার করাইতেন এবং কীর্ত্তন করাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব উৎসব অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, ভক্তিমান্ ব্যক্তি ব্যতীত এক দণ্ড ভক্তিহীন সংসারী লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে পারিতেন না। সাধনাবস্থা হইতে অদ্যাবধি রজোগুণী লোক দেখিলে অমনি তথা হইতে দূরে পলায়ন করিতেন। হৃদয় আপনার জীবনের জীবন স্বরূপ কনিষ্ঠ মাতুলকে ভাল বাসিতেন, একদণ্ড তাঁহারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সাধনান্তে এমন পূর্ণ মাত্রায় শিশু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, হৃদু যাহা বলেন তাহাই করেন; হৃদু যেমন রাখেন তেমনি থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তজন সঙ্গ ভালবাসেন, তাই হৃদু প্রত্যহ একটা মহোৎসবের আয়োজন করেন আর তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করেন। হৃদয়ের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া অতি ভক্তি সহকারে প্রত্যহ তাঁহাকে আহার করাইতেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিহোড়ে অবস্থিতি কালে তিনি প্রত্যহ তাঁহার চরণ ধৌত, আপন মস্তকের কেশদ্বারা তাহা মোচন ও পুষ্প বিল্বাদি দিয়া সুচারুরূপে চরণ পূজা করিয়া তৎপরে জলগ্রহণ করিতেন। একদিন চরণ পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন, যেন কাশীধামে সজ্ঞানে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে চরণ অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, "তাই হবে, কাশীতে তোমার সজ্ঞানে দেহত্যাগ হবে।" প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক দিন হৃদয়কে কহিলেন, "আমি বিলিতী কুম্‌ড়ো খাব।" হেমাঙ্গিনী দেবী তখন প্রায় সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, আবার ঠিক্ সেই সময়ে তথায় কুমড়া দুষ্প্রাপ্য। যাহা হউক হৃদয় সর্ব্বত্র অন্বেষণ

করিয়া কুত্রাপি উহা পাইলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিশুর ন্যায় আব্দার করিতে লাগিলেন, "কুম্‌ড়ো নইলে ভাত খাব না।" বিষম বিপদ্, হৃদয় পুনরায় কুমড়ার চেষ্টায় বহির্গত হইলেন। খানিক দূর যাইয়া এক-জন চাষার ঘরের চালের উপর একটী মাত্র কুমড়া দেখিয়া গৃহস্বামীকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়াও তাহা লইবার মানস জানাইলেন। গৃহস্বামী কহিল, "ওটী ঠাকুরদের জন্যে রাখা আছে, কিছুতেই দিতে পারব না।" ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। তাঁহার প্রাণসম মাতুলের ঈপ্সিত বস্তু সম্মুখে দেখিয়াও ফেলিয়া যাইতে হৃদয় তাঁহার প্রাণটী যেন সেই কুমড়ার সঙ্গে ফেলিয়া গেলেন। অতি বিষণ্ণবদনে তাঁহার মাতুলকে যাইয়া কহিলেন, "কি করব মামা পেলুম না।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই পূর্ব্বমত কহিলেন, "আমি বিলাতী কুমড়া নইলে ভাত খাব না।" ইতিমধ্যে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম এবং তাঁহাদের আত্মীয় নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী কুমড়া লইয়া তথায় উপস্থিত। হৃদয় কুমড়া দেখিয়া কহিলেন. "দাদা তোমরা এ কুমড়া কোথা পেলে?" রাজারাম কহিলেন, তাঁহারা পথে আসিতেছেন এমন সময় অমুকের চাল হইতে এই কুমড়াটী একটা হনুমান ছিঁড়িয়া পথে তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া পলায়ন করিল, আর তাঁহারা উহা কুড়াইয়া আনিলেন। তখন হৃদয় সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে কহিলেন। সেই কুমড়া রন্ধন হইলে তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহা আনন্দের সহিত আহার করিলেন।

কামারপুকুরে আসিয়া একদিন হৃদয়কে কহিলেন যে, শ্বশুরালয় যাইবেন। হৃদয় আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে মথুরানাথ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বেশভূষা করিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্বশুরালয় যাইবেন সম্বাদ পাইয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহাকে দেখিতে

আসিলেন। তিনিও হাসিতে হাসিতে হৃদয়ের সঙ্গে কিয়দ্দূর যাইয়া হঠাৎ মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত দেখিয়া হৃদয় ও ধনি কামারনি তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। সে দিন আর শ্বশুরালয় যাওয়া হইল না।

পরদিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা কোন ব্রত উপলক্ষে নৈবেদ্যাদির আয়োজন করিয়া পূজা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বালকের মত কহিলেন, "আমার নৈবিদ্যি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।" তাঁহারা কহিলেন, "বেশ খাও।" অমনি ভাবাবিষ্ট হইয়া নৈবেদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা পাগল জামাই আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল যে, জামাতা যথার্থই পাগল। যাহা হউক, সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সিহোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই চারি দিবস তথায় এইরূপ যাতায়াত করিলেও শ্বশুরালয়ের লোকেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিল।

কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন কালে বর্দ্ধমান ষ্টেসনে আসিয়া শ্রীরামকৃদেব কিয়দ্দূরে মাঠে শৌচে গমন করিলেন। যেস্থানে বসিলেন, তথায় অনেক কালাকর্পূর ছিল। কালাকর্পূর এক প্রকার ছোট গাছ, ইহার পত্রপুষ্পে মহাদেব বড়ই সন্তুষ্ট হন। সেই সমস্ত পত্র পুষ্প দেখিয়া তাঁহার শিব পূজা করিবার ইচ্ছা হইলে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া সেই অশুচি অবস্থায় পত্রপুষ্প তুলিয়া আপন মস্তকে অর্পণ পূর্ব্বক পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে ট্রেন পাছে

ছাড়িয়া দেয়, এই ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া হৃদয় তাঁহাকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আপন মস্তকে পূজা করিতেছেন। হৃদয় ইহা দেখিয়া ভাবিলেন, আজ আর দেখিতেছি কলিকাতায় যাওয়া হইল না। তৎপরে হৃদয় এক গাড়ু জল আনিয়া স্বহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের শৌচাদি কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় কোলে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে ষ্টেসনে আসিলেন এবং অতি কষ্টে টিকিট্ লইয়া একখানি গাড়ীতে বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে গাহিতেন, "শুচি অশুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। তুই সতীনে পীরিত হলে, তবে শ্যামামাকে পাবি।" বোধ হয় তদনুযায়িক আপনি অশুচি অবস্থায় পূজা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন মথুরকে কহিলেন, "দেখ, সাধু ভোজন করাতে ইচ্ছে হচ্চে।"

মথুর বলিলেন, "বেশ কথা বাবা. কি রকম খাওয়াবে বল, আমি আজই সব উদ্যোগ করে ফেলি।" পরদিন তিন চারি শত সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার জানবাজারস্থ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং তদুপযুক্ত বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যাদি প্রস্তুত করাইলেন। ভোজনে বসিবার সময় সাধুগণের মধ্যে দলাদলী লইয়া একটা মহা গোল পড়িয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য হইলেন। অনন্তর বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর সকলে ভোজনে উপবিষ্ট হইলে. তিনি স্বহস্তে পরিবেশন্ করিতে লাগিলেন। পরিবেশনের ব্যস্ততায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার কটিদেশ হইতে পরিধেয় অপসৃত হইতে লাগিল, অমনি হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া কাপড় পরাইতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই বালকের মত দিগম্বর, পরিবেশনই করিতেছেন. কোনরূপ সঙ্কোচ

নাই, ভ্রূক্ষেপও নাই। হৃদয় আসিয়া পুনরায় কাপড় পরাইয়া দিলেন।

বাটীর মহিলাগণ বহু অলঙ্কার বিভূষিতা হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তে সাধু সেবা দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুগণ অমনি আহারে ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধুদিগের এই অসাধু আচরণ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে মৃদুভৎর্সনার সহিত কহিলেন, "তোমলোক্ সাধু হ্যায়। কেয়া দেখতে হো? ভোজন করো। মায়ি লোক শর্ম্মাতি হ্যায়, ভোজন করো!" তাঁহার কথায় সাধুগণের চৈতন্য হইল, এবং লজ্জাবনত-মস্তকে পুনরায় ভোজন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে মথুরানাথ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন।

আদি-ব্রাহ্মসমাজে বহু লোক সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন শুনিয়া, তথায় কি প্রণালীতে উপাসনা হয় তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। মথুরানাথ একদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাইলেন। কেশব চন্দ্র সেন তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। ধ্যানের সময়চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকলে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কেশবকে দেখাইয়া কহিলেন, "ঐ ছেলেটীর ফাত্নায় মাছ ঠোকরাচ্চে, আর কারুর কিছু হচ্ছে না।" কেশবচন্দ্রকে এই তাঁহার প্রথম দেখা, এবং এই দেখাতেই বুঝিয়াছিলেন যে কেশব ধ্যানপরায়ণ আর তথায় যত লোক ছিলেন কাহারও ধ্যানাবস্থা হয় নাই।

## তীর্থযাত্রা।

মথুরানাথ এবং তাঁহার পত্নী প্রাণপণে প্রভুদেবের সেবা করিতেছেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া ভগবচ্চর্চ্চা করেন। একদিন কথায় কথায় তীর্থভ্রমণের কথা উত্থাপিত হইলে মথুরানাথের পত্নী মথুরকে কহিলেন, "চল না আমরা তীর্থ করে আসি?"

মথুরানাথ কহিলেন, "তীর্থে গিয়ে কি হবে? যদি ঠাকুর দেবতা দেখ্‌তে যেতে হয়, ত বাবাকে দেখলেই হল। আমার ত ও সব ভাল লাগে না, আমার মনে হয় ওতে কেবল কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ আর শরীরের কষ্ট। যাঁকে দেখ্‌লে সর্ব্ব তীর্থের ফল হয়, যাঁর কটাক্ষে ভক্তি-মুক্তি মেলে, সেই তিনি আমার ঘরে; তাঁকে ফেলে কোথায় যাব? আমি ত কোথাও যাচ্ছি নি। তোমার যেতে ইচ্ছে হয় নিজে যাও। আমি যাব না।"

মথুরের পত্নী কহিলেন, "তা কেন, বাবাকে ফেলে যাবে কেন; বাবাকেও নিয়ে চল।"

মথুর কহিলেন, "বাবা যান্ ত যাব।" তাঁহার পত্নী এই কথা শুনিয়া আগ্রহ সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, "বাবা আপনি যেতে রাজি হোন; আপনি না গেলে হবে না বাবা!" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তের কাতরতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। মথুরানাথের সকল আপত্তি অমনি উৎসাহে পরিণত হইল, এবং অচিরে তীর্থ যাত্রার সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্ত করা হইল। দিন স্থির হইলে একখানি দ্বিতীয় ও তিন খানি তৃতীয় শ্রেণীর সম্পূর্ণ গাড়ী এরূপ বন্দোবস্তে লওয়া হইল যে আরোহিগণের যে ষ্টেসনে আবশ্যক হইবে সেই স্থানেই সমগ্র ট্রেন হইতে ঐ চারিখানি গাড়ী পৃথক করিয়া

লইতে পারা যায়। ফাল্গুন মাস নাতিশীতোষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মথুর ও হৃদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর এক অংশে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতাঠাকুরাণী, মথুরের পত্নী ও পুত্রবধূ অপর অংশে; পাচক-ব্রাহ্মণ, দ্বারবান্, দাস দাসী প্রভৃতি প্রায় একশত পঁচিশজন লোক তিন খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া শুভদিনে তীর্থ যাত্রা করিলেন।

মোগলসরাএর এক ষ্টেসন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহসা অতিশয় পেটের পীড়া আরম্ভ হইল। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে শৌচে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সুবিধা হয় না, এজন্য ষ্টেসনে নামিয়া শৌচে গেলেন, হৃদয়ও সঙ্গে গেলেন। মথুর বন্দোবস্ত মত গাড়ীগুলি পৃথক্ করিয়া লইতে যাইতে-ছেন এমন সময় ট্রেন ছাড়িয়া দিল, তিনি অগত্যা দৌড়িয়া গাড়ীতে উঠিলেন বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয় যেন শূন্য হইয়া গেল ও চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। পরের ষ্টেসনে নামিয়া পূর্ব্ব ষ্টেসনের ষ্টেসনমাষ্টারকে তার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পরবর্ত্তী গাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং মোগলসরাই ষ্টেশনে তাঁহা-দের জন্য যানাদির বন্দোবস্ত করিয়া অতি বিমর্ষচিত্তে কাশীধাম প্রবেশ করিলেন। প্রথম যাইয়া চৌখাম্বার প্রসিদ্ধ রাজা মিত্রদের বাটীতে উঠিলেন। এদিকে ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে হৃদয় কি প্রকারে তাঁহার জীবনের জীবনকে লইয়া কাশীধামে পঁহুছিবেন, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে একখানি মালগাড়ী আসিয়া উপস্থিত। বাগবাজারের সুপরিচিত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ট্রেনে একখানি প্রথমশ্রেণীর গাড়ীতে ছিলেন। তিনি গাড়ীহইতে তথায় রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং তাঁহাকে ও হৃদয়কে অতি সাদর-পূর্ব্বক আপন গাড়ীতে উঠাইয়া মোগলসরাই ষ্টেসনে নামাইয়া দিলেন।

ভাগীরথীর বক্ষে নৌকার উপর হইতে বারাণসী দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং প্রত্যক্ষ করিলেন কাশী সুবর্ণময়ী। হৃদয় তাঁহাকে মথুরের নিকট উপনীত করিলে মথুরানাথ যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন, এবং আনন্দে বারংবার প্রভুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রভাতে মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একখানি পাল্‌কীতে লইয়া, পার্শ্বে স্বয়ং, অপর পার্শ্বে হৃদয়, অগ্র-পশ্চাৎ বহুসংখ্যক রৌপ্য-মণ্ডিত ছত্র-দণ্ডধারী দ্বারবান্‌ সমভিব্যাহারে দেবদেবী দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্‌কীতে উঠিয়াই ভাবাবিষ্ট হইতেন, এবং প্রতি দেবালয়ের নিকটস্থ হইলেই তাঁহার ভাব এত প্রগাঢ় হইত যে, হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া নামাইতেন এবং দর্শনাদি করাইয়া পুনরায় পাল্‌কীতে উঠাইয়া দিতেন। তিনি কেদারনাথের মন্দিরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর সমাধিস্থ হইতেন।

মিত্র মহাশয়েরা বিষয়ী লোক, তাহার উপর সেই বৎসর তাঁহাদের জমিদারীতে কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের বৈঠক-খানায় সেই সমস্ত বিষয়কর্ম্মের চর্চ্চাই হইত। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অঙ্গে যেন অগ্নি বর্ষণ করিত। একদিন তিনি সেই যন্ত্রণায় রোদন করিয়া কহিলেন, "আমায় তীর্থে এনে এ কোথায় রাখলি মা, আমি দক্ষিণেশ্বরে ত বেশ ছিলুম, সেখানে কেমন সৎচর্চ্চা হতো. আর এখানে কি মা, কেবল রাতদিন সাংসারিক কথা, আমার গা জলে যাচ্ছে মা। তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল্‌ মা।" মথুরানাথ সেই দিন হইতে কেদার ঘাটে পাশাপাশী দুইটী বৃহৎবাটী ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী এই সময় নগ্ন শরীরে, মৌনীভাবে মণিকর্ণিকার

তীরে ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের কাহাকেও কোন প্রকার সাদর সম্ভাষণের ইঙ্গিতমাত্রও করিতেন না। তবে কোন বিশেষ ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইঙ্গিতে প্রশ্নের উত্তর দিতেন মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিলে, হৃদয় তাঁহাকে পাল্‌কীতে লইয়া মণি-কর্ণিকার তীরে গেলেন। তথায় যাইয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহাস্যবদনে ও করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আপনার নস্যদানীটি অভ্যর্থনার্থ তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, যেন কতকালের পরিচিত ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর এক না বহু ?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইঙ্গিতে উত্তর করিলেন, "ধ্যান করিতে গেলে এক, কিন্তু মুখে বলিতে হইলে বহু।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই উত্তর পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃদয়কে কহিলেন, "এই ঠিক্ পরমহংস অবস্থা। আর শরীরের সমস্ত লক্ষণগুলিও ঠিক্।" এই বলিয়া হৃদয়কে সমস্ত লক্ষণ-গুলিও দেখাইয়া দিলেন।

ঐ সময়ে তৈলঙ্গ স্বামী তথায় একটী ঘাট বাঁধাইতেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত আলাপের পর হৃদয়কে সেই ঘাটের জন্য দুই চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। হৃদয় কিন্তু অসম্মত হইয়া কহিলেন, "আমি দর্শন কর্‌তে এসেছি, মাটী কাট্‌ব কেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহা শুনিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "আহা হৃদু, দে রে

দে! উনি মহাপুরুষ, বলছেন, দে।” হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া দুই চারি কোদাল মাটী কাটিয়া দিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মথুরানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, কি রকম দেখলে?”

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ!”

হৃদয় কহিলেন, তোমাকে দেখাবার জন্যে তাঁকে এখানে আস্‌তে চের বল্লুম। তাঁর একজন চ্যালা বল্লে, মথুর বাবু যদি এঁর ১০১ খানি বই ১০১ টাকার কিনে বিতরণ করেন, তা হলে ইনি যাবেন, নইলে যাবেন না।”

মথুরানাথ সগর্ব্বে হাস্য করিয়া কহিলেন, “আমিও তাঁকে দেখতে চাই নি! আরে, বাবাকে যখন পেয়েছি তখন আর কাউকে চাইনি।” যাহাহউক দক্ষিণেশ্বরের রাধাকান্তজীউর সেবক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে মথুরের নিকট আনিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতদেহের সৎকার কি প্রকার হয় দেখবার জন্য এক দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে যাত্রা করিলেন। নৌকা যাইয়া উক্ত শ্মশানঘাটের সম্মুখে লাগিল, আর তিনি নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল, কিছুক্ষণ পরে ভাবে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝম্পপ্রদানের উপক্রম করিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহরক্ষক হৃদয় সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন, ধরিয়া ফেলিলেন.। রামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পরে হৃদয়কে কহিলেন, “দেখ হৃদু, আজ দেখলুম, পিঙ্গলবর্ণ একজন জটাধারী দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ মহাদেব দাঁড়িয়ে শবদাহ দেখছেন! আগে

শুনেছিলুম, বিশ্বনাথ তারক-ব্রহ্ম-মন্ত্র দেন। কি আশ্চর্য্য আজ তা প্রত্যক্ষ দেখলুম !"

কাশীধামে এক সপ্তাহ থাকিয়া তাঁহারা প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগ তীর্থের প্রথানুযায়িক সকলে মস্তক মুণ্ডন করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমার ওসব দরকার নেই।" কিন্তু মহা আনন্দের সহিত ত্রিবেণীতে স্নান করিলেন। এখানেও দেবদেবী দর্শনকালে পূর্ব্ববৎ ভাবাবিষ্ট হইতেন, হৃদয় তাঁহার হস্ত ধরিয়া সমস্তই দর্শন করাইতেন। প্রয়াগে তিঁন দিবস থাকিয়া পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

যোগেশ্বরী নাম্নী ব্রাহ্মণী যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগমায়া বলিতেন, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া অবশেষে কাশীধামে আসিয়া বাস করেন। তিনি একদিন তথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি এখানে এসেছ, আমি শুনিছি। তা আমি যেখানে থাকি, সেখানে একবার পায়ের ধূল দেবে ? সেখানে একটী আমারি মত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে। সে বড় ভক্তিমতী, তাকে যদি বাবা দয়া করে কৃপা কর।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্মত হইলেন এবং হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া পরদিন ব্রাহ্মণীর আবাসস্থলে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণীর বয়ঃক্রম এখন ন্যূনাধিক ষষ্টিবর্ষ হইবে তথাপি তাঁহাকে দেখিলে এত অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ! শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথায় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গিনীকে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি প্রণাম করিবার অগ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকরযোড়ে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং তৎসঙ্গেই এত গভীর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন যে, হৃদয় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে

ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। তৎপরে তিনি গুটি-কতক শ্যামাবিষয়ক গান গাহিয়া ও তত্ত্বকথা কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর আরও দুই দিবস এই স্থানে ব্রাহ্মণীর অনুরোধে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু সে প্রকার সমাধিস্থ আর হয় নাই।

একদিন রজনীযোগে জনকয়েক তান্ত্রিক সাধক তাঁহাকে আপনা-দের চক্রে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। তন্ত্রসাধকগণ তাঁহাকে ভাগী-রথীর তীরে এক একান্ত স্থানে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন, প্রত্যেক পুরুষেরসহিত এক একটী ভৈরবী বসিয়া আছেন। ইহারা তথায় উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে কারণ দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণ তদ্দর্শনে কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মা, আমি যে কারণ ছুঁতে পারিনি মা, খাব কেমন করে।" তান্ত্রিকগণ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া আপনারা পান করিতে লাগিলেন এবং অচিরে পানোন্মত্ত হইয়া সকলে একত্রে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও জপধ্যানাদি করিবার কোনও রূপ চেষ্টা লক্ষিত হইল না।

প্রকৃত সাধন না করিয়া তাঁহাদের এই সমস্ত ঘৃণিত আচরণ দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কাশী-ধামে এক পক্ষ কাল কাটাইয়া তৎপরে তিনি বৃন্দাবনধামে যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

মথুরানাথ কহিলেন, "বাবা, সেখানে যাবে কেন? সেখানে ত কেবল ছাড়া নেড়ীর কাণ্ড, আর সব বদমায়েসের দল।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থান দেখ্‌তে যাব। রাধাকৃষ্ণের লীলার স্থান পবিত্র স্থান, আমি সেখানে যাব।"

এই বলিয়া বালকের ন্যায় আব্দার করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

বৃন্দাবনে পঁহুছিয়া তাঁহারা নিধুবনের সন্নিকটে একটী বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব এখানে উপস্থিত হইয়াই বন পরিক্রম করিতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মথুরানাথ বালককে যেমন নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া কোন কার্য্য হইতে নিবারণ করে, তদ্রূপ বনপরিক্রমের নানারূপ কষ্টের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। রামকৃষ্ণদেব অবশেষে কহিলেন "তবে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন দেখ্‌তে যাব।"

মথুরানাথ কহিলেন, "তা বেশ কথা। তুমি আর হৃদয় দুজনে দুখানি পাল্‌কীতে যাও। আমি আর যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা হবে না, হৃদুর পাল্‌কীতে যাওয়া হবে না।" এই কথা বলিয়া হৃদয়ের মুখের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, হৃদয়ের পাল্‌কীতে যাইবার অতি প্রবল বাসনা, সুতরাং তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেব, "অ—হৃদু, তুই কেন পাল্‌কী চেপে যাবি? মথুরের কি, ও ত তীর্থস্থানে তোকে পালকী টান্‌কী চাপিয়ে পুণ্যি করতে চায়। তুই তাই বলে তীর্থ স্থানে সখ করে পাল্‌কী চেপে ঠাকুর দেবতা দেখতে যাবি কেন? তবে যে, আমি যাই, সে আমি একেবারে অচল হয়ে পড়েছি, দু পা হাঁটতে পারিনি, তায় অতটা পথ, নইলে আমার কি ইচ্ছে যে পাল্‌কী চেপে বেড়াই?" হৃদয় বুঝিলেন, তীর্থ স্থানে আসিয়া অনর্থক কোন যানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবালয়াদি দর্শন করা অবিধি। অতএব তিনি রামকৃষ্ণদেবের পাল্‌কীর সঙ্গে পদব্রজে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব পাল্‌কীতে গমন করিতেছেন, হৃদয় তাঁহার এক

পার্শ্বে পাল্‌কী ধরিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে পদব্রজে গমন করিতেছেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কতকগুলি ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব আনন্দে পুলকিত ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের নিকটে যাইবার জন্য বালকবৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া পাল্‌কী হইতে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। হৃদয়ের দৃষ্টি সতত তাঁহার প্রতিই থাকিত, এজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। কমল-লোচন মুরলীধরের কৈশোর লীলাভূমে পদার্পন করিয়াই রামকৃষ্ণ-দেবের ভাবান্তর উপস্থিত, যেন পঞ্চম বর্ষের বালক। তদুপরি শাস্ত্র-কথিত বিভিন্ন স্থান সকল যতই দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বালগোপালের ভাবসমূহ জাগরিত হইতে লাগিল। কতদূর যাইয়াই আবার দেখিলেন, একটী কুরঙ্গদল ক্রীড়াবশে ইতস্ততঃ বিচরণ করি-তেছে, অমনি কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গাভিলাষে লম্ফ দিয়া পাল্‌কী হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলেন। এবারও হৃদয়ের সতর্কতায় তাঁহার সে উদ্যম বিফল হইল। এইরূপ মনোরম দৃশ্য তাঁহাকে ঐরূপ উন্মত্ত করিতে লাগিল। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দর্শন করিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন, হৃদয় অতি যত্নে তাঁহার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য আসিলে তথা হইতে গোবর্দ্ধন যাত্রা করিলেন। গিরি গোবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হইলে হৃদয়ের আর কোন প্রকার বল কৌশল খাটিল না। কুসুম-কোমলাঙ্গ রামকৃষ্ণদেব পাল্‌কী হইতে পিঞ্জরবিমুক্ত কেশরীর ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেগে গোবর্দ্ধনের উপর উঠিয়াই সমাধিস্থ ও বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইলেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে পর তাঁহারা

তাঁহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া আনিলেন। তখন অপরাহ্ন হইয়াছিল সুতরাং সে দিবস এক ব্রজবাসীর আবাসে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন প্রত্যুষে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বৃন্দাবনধামে আসিয়া রামকৃষ্ণদেব ভেক গ্রহণ করেন। যে কয় দিবস এই স্থানে ছিলেন, তিনি হস্তে সর্ব্বদা একখণ্ড কাঁচা কঞ্চি রাখিতেন। হৃদয় যদি কখন তাঁহার হস্ত হইতে উহা কাড়িয়া লইতেন, তাহা হইলে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তাঁহার শরীর যেন লুপ্তশক্তি ও অসহায় হইয়া পড়িত, এবং সেই কঞ্চিটী যতক্ষণ না তাঁহার হস্তে পুনরায় দেওয়া হইত ততক্ষণ তিনি সুস্থির হইতে পারিতেন না। এমন কি, স্নান করিবার পূর্ব্বে উহা কাড়িয়া লইলে তিনি পাল্‌কী হইতে নামিতে পারিতেন না, পাল্‌কী যমুনায় নিমজ্জিত করিলে তাহার মধ্যে বসিয়া স্নান করিতেন।

এই সময়ে বিখ্যাত গঙ্গামাতা নিধুবনে একটী নিভৃত পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম আশীতিবর্ষ বা ততোধিক, কিন্তু মুখ দেখিলে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত না। শ্রীমতী রাধিকার জন্মস্থান বর্ষানা গ্রামেই এই সাধ্বী বর্ষীয়সী রমণী প্রায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া কিছুদিন নিধুবনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার নিকট বৃদ্ধা গঙ্গামাতা সুপরিচিতা। তাহারা তাঁহাকে শ্রীমতীর জনৈক সখি—একাকী লীলা করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা—বলিয়া জ্ঞান করিত। এতদিন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছেন কিন্তু কখন কাহারও বাটী গমন করেন নাই। রামকৃষ্ণদেব তাহার প্রভূত সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইলেন। গঙ্গামাতা রামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শনে চমকিত ভাবে কিছুক্ষণ অনিমেষনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও যতই দেখিতে

লাগিলেন, ততই আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন। এদিকে রামকৃষ্ণদেব গঙ্গামাতাকে দেখিবামাত্র শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট হইলেন। বহুকালেপ্সিত প্রিয়দর্শন সংঘটিত হইলে মানুষের যেরূপ হৃদয়কেন্দ্রস্থ মধুরভাব সমূহ উদ্ভাবিত হয়, রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে শ্রীমতীর রূপ দর্শন করিয়া বর্ষীয়সীর হৃদয়ে সেইরূপ ভক্তি রশ্মি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। গঙ্গামাতা সম্পূর্ণ পরিচিতার ন্যায় রামকৃষ্ণদেবকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। "মেরি ব্রজদুলালী, ও মেরি লাড্‌লী, আজ মেরা বড়া ভাগ্‌ হ্যায় যো তোমারা দর্শন মিলা।" রামকৃষ্ণদেবও ভাবে বিভোর হইলেন। অতঃপর গঙ্গামাতা পরম সুযোগ পাইয়া শ্রীরাধিকা জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানারূপ মিষ্টান্ন আহার করাইলেন ও আপনি সেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। রামকৃষ্ণদেবও পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় গঙ্গামাতার সহিত উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব কথা সকল কহিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া আসিলে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া হৃদয় আবাস হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি আনিয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়া হৃদয়ের সহিত গঙ্গামাতার নিকট গমন করিতেন। আহারের সময় হৃদয় আবাস হইতে অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া যাইয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় পাল্‌কি করিয়া তাঁহাকে আবাসে আনয়ন করিতেন। রামকৃষ্ণদেব ও গঙ্গামাতা ঈশ্বরপ্রসঙ্গে সমস্ত দিন একেবারে মগ্ন থাকিতেন। তিনি গঙ্গামাতার নিকটে এইরূপ পাঁচ সাত দিন যাতায়াতের পর একদিন তিনি গঙ্গামাতার সমস্ত লক্ষণাদি হৃদয়কে দেখাইয়া কহিলেন, "এঁর অতি উচ্চ অবস্থা বড় ঠিক অবস্থা।" গঙ্গামাতা অমনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তৎপরে একদিন মথুরানাথকে কহিলেন, "কুঞ্জন

লোক দেখলুম, খুব উচ্চ অবস্থা। কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর এখানে গঙ্গামাতা। এখানে গঙ্গামাতার মত আর কেউ নেই, উনি ঠিক সখীভাবে সিদ্ধ হয়েছেন।"

গঙ্গামাতার শ্রদ্ধা ও যত্নে বশীভূত হইয়া পাছে রামকৃষ্ণদেব বৃন্দাবনেই থাকিয়া যান, এই আশঙ্কায় একদিন মথুরানাথ হৃদয়কে কহিলেন, "ভাই হৃদু, বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ভার তোমার উপর।"

হৃদয় কহিলেন, "তুমি ভেবোনা, আমি মামাকে ঠিক নিয়ে যাব দেখ।" গঙ্গামাতারও বিশেষ চেষ্টা যাহাতে তাঁহার 'লাডলী' বৃন্দাবনেই থাকিয়া যান ; এবং তিনি সেই জন্য রামকৃষ্ণদেবকে অনুরোধও করিলেন। ইহা দেখিয়া হৃদয় কহিলেন, "মামা, গঙ্গামা এখন তোমায় খুব যত্ন করেছেন বটে, কিন্তু তোমার যখন পেটের অসুখ করবে, তখন তোমার কেই বা মলমূত্র পরিষ্কার করবে আর কেইবা যত্ন করবে ?"

গঙ্গামাতা অমনি বলিলেন, "কেন, আমি করব। দুলালী, তোমার মলমূত্র পরিষ্কার করা কি বেশী কথা ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা বটে, কিন্তু আমি ত আতপ চালের ভাত খেতে পারব না।"

গঙ্গামাতা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "তার আর কি, না হয় সিদ্ধ চালের ভাত খাবে। ব্রজদুলালী, তুমি এই খানেই থাক, এ তোমারি স্থান।

গঙ্গামাতা হিন্দিতে কথা কহিতেছেন, রামকৃষ্ণদেবও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিলেন, "হাম মছলি খাতা।"

গঙ্গামাতা কহিলেন, "নেহি, মছলি নেহি হোগা, আওর সব হোগা।"

চৈত্র মাস প্রায় শেষ, আগামী বৈশাখে এইবার দ্বাদশ বৎসর পরে বিশ্বনাথের শৃঙ্গার বেশ হইবে। রামকৃষ্ণদেব উহা দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে এক পক্ষ থাকিয়া মথুরানাথের সহিত কাশীধামে পুনরাগমন করিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিতেন এবং ইহা দেখিবার জন্যই কাশীধামে একমাস অবস্থিতি করিলেন।

বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালেই তাঁহার বীণ শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, মথুরানাথ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বীণ শুনাইতে পারেন নাই, কারণ সে সময়ে বৃন্দাবনে কোন বীণ বাদক উপস্থিত ছিলেন না। এখানে উপস্থিত হইয়াই মথুরানাথ বীণ বাদকের সন্ধান করিতে করিতে শুনিলেন যে, মহেশ চন্দ্র সরকার ব্যতীত আর কোন ভাল বীণ বাদক তখন কাশীধামে নাই। মহেশচন্দ্র একজন সঙ্গতিপন্ন লোক, তাঁহার কোন অভাব নাই, সুতরাং কাহারও বাটী যাইয়া শুনাইতে অসম্মত। রামকৃষ্ণদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, "তার আর কি? না হয় তাঁর বাড়ী গিয়ে শুনে আসবে।" তাহাই স্থির হইলে, অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মদনপুরায় মহেশের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাটী ত্রিতল, মহেশচন্দ্র উপরে বৈঠকখানায় ছিলেন। হৃদয় যাইয়া সম্বাদ দিলেন, "একজন মহাপুরুষ আপনার বীণ শুনতে এসেছেন।"

মহেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?"

হৃদয়—"নীচে আছেন।"

মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নীচে আসিয়া করজোড়ে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "উপরে আসতে আজ্ঞা হয়।"

রামকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে ছিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন

না; হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া তিন তলার উপরে বৈঠকখানায় আনিলেন। রামকৃষ্ণদেব উপবিষ্ট হইয়া মহেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

মহেশ বলিলেন—"আমার নাম শ্রীমহেশ চন্দ্র সরকার।"

রামকৃষ্ণদেব—"তুমি নাকি বীণা বাজাতে জান ? আমি শুনতে এসেছি, বাজাবে ?"

"আজ্ঞে বাজাব বই কি। আপনি শুন্‌লে আমার বীণ বাজান সার্থক হবে। বাজাব বই কি।" মমেশচন্দ্র করজোড়ে এই কথা বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বীণটী লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বীণের বাদ্য আরম্ভ মাত্রেই রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইতে লাগিল, আর তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা, আমায় হুঁস্ দেও মা, আমি ভাল করে বীণ শুনি।" এইরূপ বার কয়েক বলিতে তাঁহার সহজাবস্থা আসিলে মনোনিবেশপূর্ব্বক বীণের আলাপ শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া বীণে যাহা বাদিত হইতেছিল, তাহা ঐ বীণের সুরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন। মহেশচন্দ্র ইহাতে আশ্চর্য্য ও উৎসাহিত হইয়া গুটিকতক আলাপের পর গত বাজাইলেন, রামকৃষ্ণদেবও পূর্ব্ববৎ বীণের সহিত একতানে গাহিতে লাগিলেন। অবশেষে রামকৃষ্ণদেব নিজের ইচ্ছানুযায়ী গান গাহিতে লাগিলেন, এবং মহেশকে বীণে সেই গান বাজাইতে অনুমতি করিলেন। এইরূপ গীতবাদ্যে এক মহা আনান্দর স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি আটটা বাজিলে মহেশচন্দ্র জলযোগের আয়োজন করিলেন, জলযোগের পর রামকৃষ্ণদেব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। মহেশচন্দ্র সেই আনন্দ ভুলিতে না পারিয়া প্রায় প্রত্যহই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

একদিন মথুরানাথ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে কিছু দান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, রামকৃষ্ণদেব যাহাকে যে প্রকার দান করা আবশ্যক তাহা সমস্ত বলিয়া দিলেন, এবং মথুরানাথও তদনুযায়িক তথায় বহু অর্থ দান করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক, তাঁহার কুলগুরুপুত্রও তাঁহার সঙ্গে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

কাশী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে মথুরানাথ নানা প্রকার দ্রব্যাদি কাশীতে ক্রয় করিলেন। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাঁহার গুরুপুত্র তাহা দেখিয়া অমনি কহিতেন, "দাদা, আমারও ঐরকম চাই। এনে দিও।" মথুর অগত্যা তাহাই আনাইয়া দিতেন, কিন্তু অন্তরে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। একদিন তিনি রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন, "বাবা এত জিনিষ পত্র কিন্‌লুম, তোমার জন্যে ত কৈ কিছু কেনা হল না, তোমার কি চাই বল? তুমি কিছু না নিলে এত জিনিষ কেনা বৃথা হয়।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমার আবার কি চাই?"

মথুর পুনরায় করিলেন, "তা হবে না বাবা, একটা কিছু নিতেই হবে, কি নেবে বল?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে একটা কাঠের রাঙ্গা কমণ্ডলু এন।"

মথুরানাথ কাশী হইতে গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে রামকৃষ্ণদেব মথুরকে কহিলেন, "না আমার সেখানে যাওয়া হবে না। সেখান থেকে এসেছি, সেখানে গেলে শরীরটা থাকবে না।" মথুরানাথের আর গয়াধামে যাওয়া হইল না, সুতরাং সকলে একেবারে কলিকাতায় আগমন করিলেন।

---

# দরিদ্রসেবা।

গ্রীষ্মকাল, মথুরানাথের ইচ্ছা ভাগীরথীবক্ষে নৌকা যোগে বিচরণ করেন। কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেবতা রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে দূরে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ইচ্ছা, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু তিনি পুনরায় পেটের পীড়াগ্রস্ত, মথুর ভাবিলেন, "বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাই, গঙ্গার হাওয়া খেলে পেটের অসুখ ভাল হতে পারে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট নদীবক্ষে ভ্রমণের প্রস্তাব করিলেন; রামকৃষ্ণদেব সম্মত হইলেন। মথুরানাথ পরমানন্দে তাঁহাকে ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নৌযাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদিন পরে চূর্ণি নদীর মধ্য দিয়া রানাঘাটের নিকট কলাইঘাটা নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের লোকগুলি অতীব শীর্ণ, জীর্ণ, কঙ্কালসার, রুক্ষকেশ, যেন বহুকালাবধি কখন অর্দ্ধাশন কখন বা অনশনে দিনযাপন করিতেছে। পরিধানে কাহারও একখণ্ড অতি মলিন শতচ্ছিদ্র বস্ত্র, কাহারও বা তাহাও নাই, কেবল মাত্র একখণ্ড জীর্ণ মলিন বস্ত্রের কৌপীন। রামকৃষ্ণদেব লোকগুলির এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মা তোর এ কি বিচার মা। কারুর ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই, আবার কেউ বা অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। মা তোর রাজ্যে এমন অবিচার কেন মা?" মথুরানাথ তাঁহার এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, কাঁদ্‌ছ কেন, কি হয়েছে বাবা?" রামকৃষ্ণদেব সেই দারিদ্র-নিপীড়িত লোকদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, "দেখ মথুর, এদের দুঃখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি আর এ

কষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। তুমি এদের তেল দেও, কাপড় দেও, আর ভাল খাবার দেও। এরা তেলমেখে স্নান করে সবাই এক একখানি নূতন কাপড় পোরে ভাল খাবার খাক্‌। আর তুমি যতদূর পার, এদের দুঃখ দূর কর, আমি দেখি। এদের মত দুঃখী কখন দেখিনি।” মথুরানাথের জমিদারী এই স্থানে, সুতরাং তথায় যে অসংখ্য দরিদ্র বাস করিত, তাহা তিনি বিদিত ছিলেন। অন্যান্য সময়ে মথুরানাথ কোন বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার ইষ্টদেবতার ইঙ্গিতমাত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা অবাধে ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু কি জানি, এ সময়ে তিনি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “বাবা, তোমার দয়ার শরীর, দুঃখ দেখলেই তোমার কষ্ট হয়। কিন্তু এই সমস্ত লোককে খাওয়াতে যে গাদা গাদা টাকা খরচ হবে, তা ত জাননা। আমি এত টাকা কোথায় পাব?”

যাহা হউক রামকৃষ্ণদেব মথুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি রুক্ষভাবে কহিলেন, “কি, তুমি মনে কর এই ঐশ্বর্য্য তোমার? আজ মোরে গেলে কাল তোমার থাক্‌বে? এ দুনিয়ায় এক পয়সা কারুর নয়, সব মার। তোমরা বড়মানুষরা মার ভাণ্ডারী, তাঁর কাজে খরচ করবে তাঁর সেবায় খরচ করবে, জকের মত কেবল আগ্‌লে রাখবার জন্য, কি কেবল তোমাদের আত্মতৃপ্তি করবার জন্য ভাণ্ডারী হওনি। মা কি আলাদা? মা এই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। মার আজ্ঞা— এই দুঃখী দরিদ্রদের সেবা করলে তাঁরই সেবা করা হবে। তাঁরই সেবা করা হবে। তাঁরই আজ্ঞা জেনে এই সমস্ত দুঃখী লোকের সেবা কর, যত টাকা লাগে খরচ কর। তাঁর ধন তিনি সঞ্চয় করে তোমাদের কাছে রেখেছেন, কেবল তোমাদের নিজের সুখের তরে খরচ করবার জন্যে নয়। যতদূর পার এদের দুঃখ দূর কর, তাঁর

আজ্ঞা।" রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যেক বাক্য বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার শিরায় শিরায় লাগিতে লাগিল, প্রত্যেক বাক্য যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতে লাগিল। ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত মথুর একেবারে দীনভাবাপন্ন হইয়া বারম্বার তাঁহার ইষ্টদেবতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তারযোগে কলিকাতায় বস্তা বস্তা কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করিবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। তৎপরে লোক পাঠাইয়া স্থানীয় যাবতীয় দরিদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্রন করিলেন। পরদিন প্রভাতে বস্ত্রাদি আসিলে এবং আহারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে তৈল ও বস্ত্র দিয়া তাহাদিগকে স্নান করিতে কহিলেন। তাহারা সেই দিন আহারের বিপুল আয়োজন দর্শনে এবং রামকৃষ্ণদেবের দয়ালমূর্ত্তি ও স্নেহময় বাক্য শ্রবনে মোহিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "এ কে ভাই? নিশ্চয় কোন দেবতা হবে, নইলে আমাদের ওপর এত দয়া কেন করবে?" কেহ বলিল, "শুনছি নাকি কল্‌কেতা থেকে গাঁট গাঁট কাপড় আনিয়েছে, সব এই রকম বিলোবে।" আর একজন কহিল, "বটে? তাই হবে ভাই, কাল ঐ লোকটি আমাদের দুঃখ দেখিয়ে বাবুকে বলেছে, আমাদের পেট্‌টা ভরে খাওয়াতে আর হাপুস নয়নে কাঁদছেল। ভাই, আমাদের দুঃখ দেখে কাঁদে, এমন ত লোক দেখিনি!" আবার একজন কহিল, "হাঁরে, দেবতাই হবে, নইলে মানুষ কি আর গরিবকে দয়া করে, দেবতা না ত কি?" এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সকলে স্নান করিয়া আসিলে, মথুরানাথ সকলকে আহার করিতে বসাইলেন। প্রায় সাত শত লোককে একত্র ভোজন করিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিলেন, আর তাঁহার সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের বিশ্বাসও বদ্ধমূল হইয়া গেল।

আহারান্তে মথুরানাথ প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারি আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন, অনেকে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইয়া গেল। এইরূপ এক সপ্তাহ কাল দরিদ্রসেবা করিয়া মথুরানাথ রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

---

## প্রচার।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে. রামকৃষ্ণদেব শম্ভূচরণ মল্লিকের নিকট বাইবেলের যীশুতত্ত্ব শ্রবণ করিতেন। শম্ভূচরণ জাতিতে সুবর্ণ-বণিক ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। রাসমণির দেবালয়ের নিকট তাঁহার একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। কার্য্য হইতে অবসর পাইলে তিনি এই উদ্যানে আসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণদেবকে তথায় লইয়া গিয়া অতি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। ক্রমে তাঁহার রামকৃষ্ণদেবের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

রামকৃষ্ণদেবের পেটের পীড়া অদ্যাপি সারে নাই, শরীর অতিশয় শীর্ণ। শম্ভূচরণ এজন্য তাঁহাকে আপনার উদ্যানে লইয়া গিয়া একটু একটু অহিফেন সেবন করাইতেন। দিন কয়েক এইরূপ করিলে পর রোগের কিছু উপশম হইল। একদিন শম্ভুর উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন কালে এক বিন্দু অহিফেন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য শম্ভু তাঁহাকে অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কহিলেন, "সঞ্চয় করিতে পারি নি। একবার একটা আঁব গাছ-তলায় গোটাকতক আঁব পড়েছিল। মনে করলুম, নিয়ে ঘরে রেখে

দি, কারুকে দিলেও ত চলবে। আঁব হাতে করা আর চখে দেখতে পাইনি, ক্রমাগতই ঘুরচি, ঘরে যাবার পথ আর পাইনি। শেষে আঁব-গুলো ফেলে দিলুম। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" শম্ভুর কিন্তু একথা বিশ্বাস হইল না। তিনি পরীক্ষার জন্য তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটু অহিফেন কাগজে মুড়িয়া তাঁহার কাপড়ের এক কোণে বন্ধন করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু ঐ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিয়া কোন পথ দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। শম্ভু নিকটে আসিয়া তাঁহার মুখ অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন, স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, যেন সংজ্ঞা নাই। নিশীথে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে গিয়া বালকের বদনে যে প্রকার কষ্টের লক্ষণ সমূহ দেখা যায়, শম্ভু তাঁহার মুখে তদ্রূপ কাতর ভাব দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বস্ত্র হইতে সেই অহিফেন খুলিয়া লইলেন। তখন তিনি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব সহজভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং কহিতেছেন, "কি খুলে নিলে? একটু আপনি বেঁধে দিয়েছিলে বুঝি?" শম্ভুচরণ অপ্রাতভ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

কলিকাতার নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে ঘুষ্‌ড়িতে নেপালের মহারাজার শালকাষ্ঠের একটী বৃহৎ কারবার ছিল। নেপালনিবাসী কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় সেই ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বংশ পরম্পরায় ইঁহারা মহাবীর এবং মহাভক্তিমান্। বিশ্বনাথ পণ্ডিত লোক, বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁহার বড়ই প্রীতি, পূজা এবং স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া শিবনেত্র হইত, এবং ঐ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াই পূজা করিতেছেন। এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ এক দিবস স্বপ্ন দেখিলেন, এক

অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডলী মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার মন প্রাণ পরমার্থ লাভের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। কখন ইচ্ছা হইত কোন উপায়ে আবার সেই স্বপ্ন দেখেন, কখন ভাবিতেন, মহাপুরুষ স্বপ্নরাজ্যে দেখা দিয়াছেন, বাস্তব জগতে কি দেখা দিবেন না? আবার কখন বা ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি লোক মুখে শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে একজন মহাপুরুষ আছেন, তিনি ভগবৎপ্রেমে দিবানিশি উন্মত্ত, কখন হাসেন কখন কাঁদেন কখন নাচেন কখন গান করেন, আর মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হন। ভগবৎকথা ব্যতীত অন্য কোন কথা তাঁহার সহিত চলে না। জ্ঞান-পিপাসু বিশ্বনাথ আর বিলম্ব না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার সেই স্বপ্নদৃষ্ট জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্থ অপূর্ব্ব মহাপুরুষ। বিশ্বনাথ আনন্দে বিভোর হইলেন এবং অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইয়া গেল। রামকৃষ্ণদেবও বিশ্বনাথকে পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। তদবধি বিশ্বনাথ প্রায় প্রত্যহই নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার দিব্যজ্ঞানদাতার দর্শন করিতেন।

কর্ণেল বিশ্বনাথকে রামকৃষ্ণদেব বিশেষ ভালবাসিতেন এবং কাপ্তেন বলিয়া ডাকিতেন। একদিন কথায় কথায় কাপ্তেন বলিলেন, প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী নামে একজন সন্ন্যাসী আছেন এবং বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারও ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। কাপ্তেন তাঁহাকে আপনার গাড়ীতে লইয়া তখনি পাথুরিয়াঘাটা যাত্রা করিলেন। প্রসন্নকুমার

ঠাকুরের ঘাটের দক্ষিণাংশটী পর্দ্দাদ্বারা ঘেরিয়া তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কলিকাতার পূর্ব্বে নূতন খাল পার হইয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে নিভৃতে শৌচে যাইতেন, তথা হইতে কাঁকুরগাছিতে আসিয়া তত্রত্য একটী উদ্যানের পুষ্করিণীতে বহুক্ষণ ধরিয়া হস্ত পদ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ধৌত করিতেন, পরে বেলা চারিটার পর তথা হইতে গমন করিয়া দুই তিন ঘণ্টা কাল ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া সন্ধ্যার পরে তিন চারি ঘণ্টা ভোজন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে তাঁহার দুই একজন শিষ্য শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাপ্তেনের সহিত তথায় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মানন্দ "আমি খড়ম পায় দিয়ে দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ দূরে শৌচে যাই, সন্ধ্যের পর একবার মাত্র খৈ দৈ সন্দেশ খাই, বিশ পঁচিশটা ডাব খাই" ইত্যাদি অনেক বাজে কথার সঙ্গে দুই চারিটি শাস্ত্রের কথা ও জ্ঞানের কথা বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথা হইতে বিদায় লইয়া গাড়িতে উঠিলে পর কাপ্তেন প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, কেমন দেখলেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "এর কিছু সিদ্ধাই আছে মাত্র। মা কোন ছেলেকে একটা রাঙ্গা খ্যালনা, কোন ছেলেকে মেঠাই, এই রকম নানা জিনিষ দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। যে ছেলে সেই সব জিনিষে আর ভোলে না, ক্রমাগত মা মা করে কাঁদতে থাকে, তাকে মা কোলে করেন। ও একটা সিদ্ধাই পেয়ে ভুলে আছে। আর সিদ্ধাই আর শক্তি পেলেই তাঁকে ভুলে যেতেই হয়। ওটাও সেই মহামায়ার মায়া কিনা।"

ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বদা আত্মগরিমা ও আপনার সিদ্ধাইয়ের কথাই কহিতেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে পিশাচসিদ্ধ বলিয়া জানিতেন এবং

সেই কারণেই বোধ হয় তিনি সর্ব্বসাধরণে ভূতানন্দ বলিয়া অভিহিত ছিলেন।

দিন দিন দক্ষিণেশ্বরে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে, যিনি একবার রামকৃষ্ণদেবের সহিত আলাপ করেন, তাঁহার মন প্রাণ বিমোহিত হয় এবং তিনি পুনরায় তাঁহাকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না। দক্ষিণেশ্বরনিবাসীগণ কিন্তু এখনও তাঁহাকে সেই পাগল মনে করিতেছেন, কারণ তিনি পূর্ব্ববৎ কখন গভীর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন, তখন হয়ত দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন, কখন বা আপন মনে শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেছেন আর দুই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। আবার কখন বা আপনার গ্রাম্য ভাষায় গম্ভীর-তত্ত্বকথায় সমবেত লোকদিগের হৃদয়মধ্যে ভগবদ্ভক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এইভাবে দিন যাইতেছে ইতিমধ্যে একদিন মথুরানাথ আসিয়া তাঁহাকে নানাকথার পর কহিলেন, "দেখ বাবা, আমি ত কবে আছি কবে নেই। তা মনে কচ্ছি তোমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার কাগজ করে দি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কেন? টাকা কি হবে? আমার মা কালী আছেন। টাকা কড়ির দরকার নেই।"

মথুর কহিলেন, "কি জান বাবা, আমার ছেলেদের বড় বিশ্বাস করিনি। তোমার সেবা ত চাই। তা আমি তোমার নামে কোম্পানির কাগজ করে দাওয়ানজীর কাছে রেখে দেব। তোমায় তার জন্যে কোন বেগ কি হাঙ্গাম পোহাতে হবে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "আরে বাবু, তুমি ত বল্লে কোন বেগ পোহাতে হবে না, কোন হাঙ্গাম হবে না। আমি ত জানব যে

আমার টাকা আছে, আমি এতটাকার মালিক, তা তুমি দাওয়ানজীর কাছেই রাখ আর যেখানেই রাখ, মনে একটা দাগ পড়ে যাবে ত। শুধু তাই নয়, মার উপর বিশ্বাস কম হয়ে যাবে, আবার হয়ত ঐ টাকার জন্যে ফিরে জন্ম নিতে হবে। ও বড় বালাই। যাগ্, তুমি ও সব কথা মুখে এন না। আমার ভাবনা কিসের? মা আছেন, তাঁর কাছে আমার কোনও অভাব নেই।" এই বলিয়া সেইস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, যেন সঞ্চয়ের কথায় তথাকার বায়ুও দূষিত হইয়াছে। মথুরানাথও বুঝিলেন যে, এ প্রস্তাবে তিনি শ্রীরাম-দেবকে কোন প্রকারেই সম্মত করিতে পারিবেন না, ইহা স্থির করিয়া তিনি আর কখনও ঐ বিষয় কোন কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করেন নাই।) কিন্তু ভাবিলেন, "বাবার মাকে যদি কিছু দিতে পারি তা হলেও আমার মনে সন্তোষ হয়।" রামকৃষ্ণদেবের মাতাঠাকুরাণীর নিকট গমন করিয়া মথুরানাথ কহিলেন, "আপনার কি অভাব আছে, আমায় বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার অভাব মোচন করতে চেষ্টা কর্‌ব।"

চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "আমার কোন অভাব নেই বাবা। আমি গঙ্গাস্নান করছি, মা কালীর প্রসাদ পাচ্ছি, গঙ্গার তীরে দেবালয়ে বাস করছি, আর আমার কি চাই? কিছু ত চাইনি বাবা, আমার আর কোনই অভাব নেই।"

মথুরানাথ দেখিলেন, এ প্রকারে বৃদ্ধাকে কিছু গ্রহণ করাইতে পারিবেন না। ভাবিলেন, জিদ করিলে হয়ত আমার আব্দার রক্ষার জন্যও কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারেন। কহিলেন, "আমি তা বলছিনি। আমার বড় ইচ্ছে যে, আমি আপনাকে কিছু দিই। তাই বল্‌ছি, আপনি কি নেবেন বলুন।"

চন্দ্রাদেবী কহিলেন, "কি নেব বাবা, আমার ত কোন জিনিষের দরকার নাই।"

মথুরানাথ বলিলেন, "তা হবে না ঠাকুরমা, আপনাকে কিছু নিতেই হবে; আপনি কিছু নিলে আমার জন্ম সার্থক হবে। তাই বলছি, আপনাকে কি দেব বলুন?"

চন্দ্রাদেবী মথুরের কাতরতা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "আচ্ছা তবে তুমি আমার চার পয়সার দোক্তা কিনে দিও।" চন্দ্রাদেবী পানের সঙ্গে দোক্তা ব্যবহার করিতেন।

মথুর ভাবিতেছিলেন, চন্দ্রাদেবী হয়ত বলিবেন, "আচ্ছা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই দিও।" কিন্তু তাহার মুখে বিপরীত কথা শ্রবণে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "আহা এমন উদার না হলে কি ভগবান্‌কে পেটে ধরতে পারতেন্।

তীর্থ হইতে আসিয়া আজ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু পেটের পীড়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর এখন অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল, তত্রাপি কোন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির নাম শ্রবণ করিলেই স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কেশব এখন একজন মান্যগণ্য লোক, বহুস্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্মবিষয়ে একজন নেতা হইয়াছেন। ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের মুখে কেশবের সুখ্যাতি শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কেশবকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কাপ্তেনের গাড়ীতে বেলঘরিয়ার একটী উদ্যানে গেলেন। কেশব এই সময় সশিষ্যে সেই উদ্যানে ছিলেন। গাড়ীতে উঠিবার অগ্রেই ভাবাবিষ্ট হইয়া মা কালীকে বলিতে লাগিলেন, "মা যাবি? কেশবকে দেখ্‌তে যাবি?" এইরূপ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আপনিই

উত্তর করিলেন, "যাব।" গাড়ীতে বসিয়াও ভাবাবস্থায় মা কালীর সহিত কতই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। বেলঘরিয়ায় উদ্যানে উপনীত হইলে প্রথমে হৃদয় নামিয়া কেশবের নিকট গেলেন। কেশব তখন তাঁহার অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। হৃদয় তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমার মাতুল হরিপ্রসঙ্গ শুন্‌তে বড় ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন শুন্‌তে এসেছেন।"

কেশব কহিলেন, "আচ্ছা, তাঁকে, আনুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবের ঘোরে ছিলেন, হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া আনয়ন করিলেন। একে তাঁহার শরীর কৃশ, তদুপরি পরিধানে কেবল একখানি সামান্য লালপেড়ে কাপড়, কোঁচার খুঁটটী স্কন্ধে ফেলা। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমেই অনুমান করিলেন, কে একজন সামান্য লোক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "বাপু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করে থাক? সে কি রকম দর্শন তাই জান্‌তে এসেছি। এই বলিয়া সেই অল্প ঘোরের অবস্থাতেই স্বয়ং ঈশ্বর প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর দর্শন কি প্রকার কথঞ্চিৎ বলিয়া গাইতে লাগিলেন, "কে জানে কালী কেমন" ইত্যাদি। তাঁহার গান শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূতি হইত। সে বিশুদ্ধ ভাব, প্রেমানন্দবিকশিত অঙ্গকান্তি, এবং প্রাণস্পর্শী মধুর কণ্ঠধ্বনি, কেশব দেখিলেন অতুলনীয় এবং প্রাণে পরামানন্দ বরিষণ করিতেছে। গানটী গাইতে গাইতে তিনি ক্রমে সমাধিস্থ হইলেন। স্পন্দহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, অপূর্ব্ব হাস্যব্যঞ্জক বদন, প্রেমাশ্রুবিগলিত রক্তাভ নয়ন—মূর্ত্তি দেখিয়াই সকলে স্তম্ভিত। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কেহই সমাধি দেখেন

নাই, এমন কি, ভাব কাহাকে বলে তাহাও জানেন না। হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কর্ণে ক্রমাগত প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন সকলকে ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ আবার কি ভেল্কী? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শেষে ব্যাপার কি হয় দেখিবার জন্য হৃদয় যাহা বলিলেন তাহাই করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসিয়া উঠিলেন, এবং সেই ভাবাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ, একটা গাছে একটা বহুরূপী ছিল। একজন তাকে দেখে এসে বল্‌লে, সেটা লাল। আর একজন দেখে এসে বল্লে সেটা সবুজ। আর একজন বল্লে, না সেটা হল্‌দে। আর একজন বল্লে তা নয় সেটা নীল। মহা তর্ক লেগে গেল, শেষে সকলে মিলে সেই গাছতলায় যে একজন লোক থাকত তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে। সে বল্লে, "তোমাদের সকলকারই কথা ঠিক। ওটা বহুরূপী; কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল।"— ঈশ্বর সেই রকম। তাঁর অনন্তরূপ যে সাধক যেরূপ দেখেছে, সে জানে তিনি বহুরূপী। তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আবার আরও কত আকার আছে, তা কে বল্‌তে পারে?"

"পাঁচ জন অন্ধ হাতী দেখ্‌তে গেছ্‌ল। চোকে ত দেখতে পার না, হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এল। কেউ শুঁড় দেখলে, কেউ পা দেখলে, কেউ পেট দেখলে। দেখে এসে তাদের মধ্যে মহা ঝগড়া বেঁধে গেল। কেউ বলে, হাতী জলের জালার মত, কেউ বলে, না, হাতী থামের মত, কেউ বলে কুলোর মত—মহা বিবাদ। গোল-মাল শুনে একজন জিজ্ঞাসা কল্লে, কিসের ঝগড়া। সবাই বুঝিয়ে বল্লে। তখন সে বল্লে, "বাপু, তোমরা কেউ হাতী দেখনি, কেউ তার

পেট্‌টা, কেউ পাটা, কেউ শুঁড়টা, কেউ কাণটা মাত্র দেখেছে। ঐ রকম সচ্চিদানন্দের একটু সামান্য অংশ দেখে লোকে মহা ঝগড়া করে।"

"একটা ডেও পিঁপ্‌ড়ে চিনির পাহাড়ে গেছ্‌ল। একটা দানা মুখে করে পলাল, আর সেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ। আর শক্তি কোথা যে খাবে? সেই রকম ভগবান্‌কে জেনে কে শেষ করতে পারে? আবার তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে জানবার যোটী নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপে ভাবের অবস্থায় সামান্য সামান্য কথায় গভীর তত্ত্ব সকল বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা নাকি শক্তি মান না?" এবং তৎপরক্ষণেই ঈষৎ হাসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "শক্তি না জানলে ব্রহ্ম জানবার যো নেই, সে যে অভেদ। যেমন আগুন আর দাহিকা শক্তি। একটা ভাবলে আর একটা ভাবতেই হয়। মণি আর তার আভা। একটা ছেড়ে আর একটা ভাবা যায় না। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ ছেড়ে কি সূর্য্য ভাবা যায়? তেমনি ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভেদ। সৃষ্টির বিকাশ যখন করেন, তখন তাঁকে শক্তি ভাবা যায়—আদ্যাশক্তি মা আনন্দময়ী, আবার যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম।"

"তা সেই সচ্চিদানন্দময়ীকে মা আনন্দময়ী, মা কালী, মা দুর্গা, ভক্তের যার যেমন ইচ্ছে তাই বলে ডাকে। একটা জলাশয়, তার অনেকগুলো ঘাট আছে। এক ঘাটে হিন্দু জল খাচ্ছে। আর এক ঘাটে মুসলমান জল খাচ্ছে, আর এক ঘাটে কৃশ্চান জল খাচ্ছে। সেই এক জলই সবাই খাচ্ছে, নাম দিচ্ছে—জল, পানি, ওয়াটার।"

"সোনার আতা দেখেছ?"

কেশব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "সেই সোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, তেমনি মাটীর মা কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মা কালী, মা আনন্দময়ীর উদয় হয়।"

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার আনন্দমাখা মুখের প্রতি তাকাইয়া অপূর্ব্ব সারগর্ভ কথাসকল শুনিতেছেন। তাঁহারা সকলে কি রকম ঈশ্বর দর্শন করেন জানিতে আসিয়া, ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে তিনি নিজেই যাহা জানাইয়া দিলেন, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য। কেশব ভাবিলেন, "ইনি ত দেখছি ঈশ্বর জানা লোক, ইনি ত যে সে নন!" যাহা হউক, একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখাৎ অবিরাম প্রাণসঞ্চারিণী-তত্ত্ব-প্রবাহ চলিতেছে, অপর দিকে বহুলোক-সন্মানিত নবীন-ব্রাহ্ম-সমাজ-নেতা কেশব আপনার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সেই অমিয়প্রবাহের কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বিনীত ও সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছেন। সেদিন সকলে উপাসনা ভুলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু অপার আনন্দে মগ্ন।

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার ল্যাজ খোসেছে।" এই কথা শুনিয়া কেশবের অনুচরগণ কিছু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। কেশব তাঁহাদের কহিলেন, "তোমরা অমন করে হাস কেন, একথার অবশ্য কোন গূঢ় অর্থ আছে। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, উনি বুঝিয়ে বল্‌বেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝাইয়া কহিলেন, "দেখ, যতদিন ব্যাঙ্গাচির ল্যাজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। তার পর ল্যাজ খোসে গেলে সে জলেও থাক্‌তে পারে আবার ডাঙ্গায়ও থাক্‌তে পারে। তেমনি মানুষের যত দিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। তা তোমার সে অবিদ্যারূপ ল্যাজ খোসেছে। এখন মনে কল্লে সংসারেও থাক্‌তে পার আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পার।" এই

সামান্য উপমাটীর মধ্যে এত গভীর তত্ত্ব নিহিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। এই আলাপের পর কেশবের মন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেই সময় হইতে তিনি প্রায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, সময়ে সময়ে অতি যত্ন করিয়া তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া যাইতেন, এবং প্রতি বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের পরদিন সদলবলে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ষ্টীমার যোগে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করা তাঁহাদের সেই সাম্বৎসরিক উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করিতেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মা কালীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "মা, চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনে লোকে কি রকম মাতামাতি কর্‌ত, আমায় দেখিয়ে দে মা।" এই প্রার্থনার কিছু দিন পরেই তিনি ভাবাবস্থায় অদ্ভুত সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় দর্শন করেন এবং পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সম্মুখাগত ভক্তবৃন্দের ভিতর শ্রীযুক্ত বলরাম বসুকে দর্শন করেন। ইহার অল্পকাল পরে হৃদয় আপনার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক কিছু দিনের জন্য বাটী যাইয়া বাস করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কার্য্যে অবসর লইয়া বাটীতে যাইয়া বাস করিতেন। কিন্তু যখন তথায় যাইতেন, আপনার প্রাণসম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কারণ, একাকী বাটী চলিয়া গেলে তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবার ত্রুটি হইতে পারে। এইবারও বাটী যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সম্মত হইলেন।

যে দিবস তাঁহারা সিহোড়ে উপস্থিত হইলেন, সেইদিন হইতেই তথায় জনতা আরম্ভ হইল। সিহোড়ের চতুঃপার্শ্বস্থ নানা গ্রামের ভদ্র-

লোক সকল আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তৎপরদিন হইতে অনেক কীর্ত্তনের দল আসিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহারা একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রীতি অনুভব করেন, তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপে প্রতিদিনই জনতা বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহারা প্রতিদিনই কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে এক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সিহোড় গ্রামের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে আপনার গুরুবৎ জ্ঞান করিতেন, আবার কেহ বা তাঁহার মধ্যে নিজ ইষ্টদেবতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে আপনাপন ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিতেন।

৺ নটবর গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আপনার ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধে বিচার হয়। পণ্ডিতগণ কঠিন সমস্যা সকল তাঁহার সরল উদাহরণ ও উপমার দ্বারা পরিস্কার রূপে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নটবর গোস্বামীর পত্নী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী।" ইঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

সিহোড়ের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে শ্যামবাজার নামক একটী গ্রাম। এখানে চব্বিশ্ প্রহরী হরিসংকীর্ত্তন হইতেছে শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব উহা দেখিতে যান্। কীর্ত্তনের প্রারম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ বাহ্য চৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী

করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্ব্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহ-সরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখন বা মহা-ভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ, স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে। অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতে-ছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন। গ্রামগ্রামান্তরের ইতর লোকে বলিতে লাগিল, "শ্যাম-বাজারে একজন লোক এসেছে, সে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে দিনে সাত-বার মরে যাচ্ছে আবার বেঁচে উঠ্‌ছে।" ক্রমেই আনন্দের প্রবাহ দিগ্‌দিগন্ত ছাইল, সহস্র সহস্র লোক মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বা মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। দূরাৎসমাগত ব্যক্তিগণ যাঁহারা কখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার মানসে কেহ কুটীরের চালের উপর হইতে কেহ বা বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। সকলেই চিত্রা-র্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে সেই আনন্দমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন। যাঁহারা কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন, সকলেই আনন্দে বিভোর, তিলার্দ্ধ বাহ্য-জ্ঞান নাই। গ্রামের মহিলাগণ পর্য্যন্ত কেহ বা শঙ্খ লইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন কেহ বা উলুধ্বনি করিতেছেন, আবার কেহ বা তাঁহার দর্শনমানসে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখায় উঠিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। অমনি পুনরায় শঙ্খ কাঁশর ঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও হুহুঙ্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্ত্ত-নের মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্যায় ভাসমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও জ্ঞান নাই॥

পুনরায় রাত্রি আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইল। এইরূপে তিন দিন অতীত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাব সম্বরণ করিয়া অজ্ঞাতসারে তথা হইতে একেবারে সিহোড়ে চলিয়া আসিলেন। তিনি চলিয়া আসিলে পর সকলে যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথা হইতে কামারপুকুরে আসিলেন এবং তথায় কিছু দিন থাকিয়া সেখান হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্নীর বাটীতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভগ্নী তামাক সাজিয়া তাঁহার স্বামীকে দিতে যাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার ভগ্নীর পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ দৃশ্যটী এত সুন্দর রূপে আঁকিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন, যে সকলে দেখিয়া তাঁহার ভগ্নীও ভগ্নীপতিকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং ভগ্নীর হুঁকাটী বহন করিবার ভাব দেখিয়া পতিভক্তির আদর্শ স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতিবারই পানিহাটীর মহোৎসব দেখিতে গমন করেন এবং যে কীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতেই আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে ও যাবতীয় লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পানিহাটিতে তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া গোস্বামিগণ এইবার ভাবিলেন, "রামকৃষ্ণদেব শক্তি উপাসক, আমাদের বিরুদ্ধ মতের লোক। আর ইনি এসে আমাদের সব লোককে ভাঙ্গিয়ে নিচ্চেন।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইবার তথায় আগমন করিলে তাঁহাকে প্রহার করিবেন। মথুরানাথ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার গমনকালে সঙ্গে জনকয়েক বলবান্ দ্বারবান লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কহিলেন, "রাজসিকভাবে দেবতার

স্থানে যেতে নেই। ভয় কি, মা রক্ষা কর্‌বেন।” তিনি কেবল হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। কিয়দ্দূর হইতে কীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। পাছে জলে পড়িয়া যান, এজন্য হৃদয় তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। নৌকা তীরে লাগিবামাত্র তিনি লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলেন এবং দৌড়িয়া নিকটবর্ত্তী কীর্ত্তনের দল মধ্যে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে মথুর অতিশয় চিন্তিত হইয়া জনকয়েক দ্বারবান সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আনন্দে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কীর্ত্তনের দলস্থ সকলে একেবারে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া গাহিতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন, আর সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তাহাতে যোগ দিতেছেন। তাঁহার দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠস্বর, হৃদয়গ্রাহী আঁকর ও সুললিত নৃত্য দেখিয়া ব্যক্তিমাত্রেই বিমোহিত। অনেকে হরিনাম করিবেন কি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা। কেহবা তাঁহার নৃত্য দেখিয়া মনে করিতেছেন,‘মানুষে কি এ প্রকার নৃত্য কখন দেখেছে?’ কেহ ভাবিতেছেন, এমন বেহুঁস হয়ে কীর্ত্তন কর্ত্তে ত কাহাকেও দেখিনি! কেহবা ভাবিতেছেন, ‘ইনি নিশ্চয় মানুষ নন, একবার এঁর পার ধূলা নিয়ে জীবন সার্থক করি।’ আবার কেহবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব শক্তিপ্রবাহে পড়িয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য করিতেছেন; কেহবা ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া মাটিতে লুটাইতেছেন আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন। কিছুক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তনের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভাব সম্বরণ করিলেন, ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, মুখ রক্তবর্ণ। হৃদয় তখনি তাঁহাকে জনতার মধ্য হইতে দূরে লইয়া গেলেন ও উপবেশন করাইয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু লোকে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার জন্য ব্যস্ত, দেখিয়া আশ মিটে না, আবার অনেকে তাঁহার দুই একটা কথা শুনিবার জন্য মহা আগ্রহ সহকারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত। ক্রমে যে জনতা, সেই জনতা। ইতিমধ্যে ভক্তগণ জনে জনে মালসাভোগ হস্তে সেই জনতা ভেদ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সকলের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, আর সকলের সহিত মধুর আলাপ করিয়া তাহাদের প্রাণ মন কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। "বড় দেরি হয়ে গেল, তা এইবার এই কথাটা শুনে যাচ্ছি," অনেকেই এরূপ মনে করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার সেই মনভুলান গল্প ও আনন্দমাখা কথা ছাড়িয়া কে যাইতে পারে ? যাহা হউক ক্রমে তিনি আপনিই প্রস্থান করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে লোকে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন দেখিলেন।

আশ্বিন মাস সমাগত, শারদীয় পূজার সময় সন্নিকট, প্রকৃতি যেন সেই আশায় প্রফুল্লিতা, ভুবনমোহিনীর অভ্যর্থনার্থে যেন তিনি নূতন বেশ পরিয়াছেন। রবির কিরণে, নীল আকাশে, শান্ত সমীরণে, নব পল্লবধারী পাদপনিচয়ে, প্রেমময়ী ভাগীরথীর খরপ্রবাহে, নরনারীর হৃদয়কেন্দ্রে, সর্ব্বত্রই যেন একটা নূতন আশা জাগিয়া উঠিতেছে ও সকলের হৃদয় হইতে যেন 'দুর্গা দুর্গা' ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কমলকুল মাতৃচরণ সেবিবার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব, আনন্দ, আনন্দ, সর্ব্বত্র আনন্দ। কিন্তু এই সার্ব্বজনীন আনন্দের সময় কেবল হৃদয়ানন্দ চিন্তান্বিত, ভাবিতেছেন—এ আনন্দের দিনে কেমন করিয়া মা সর্ব্বমঙ্গলাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিবেন। সকল বিষয়েই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণ বই আর গতি নাই, তাঁহার অনুমতি

ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে সাহস হয় না। আজ সেই জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া শারদীয় পূজার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "সে যে ঢের খরচ, হৃদু, তুই পারবি কেন?"

হৃদয় কহিলেন, "মামা, আমি যেখানে থেকে পারি কর্‌ব। দুর্গোৎসব করতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "যারা দুর্গোৎসব করে, তারা হয় স্বপ্ন দেখে, না হয় আদেশ পায়। তুই তা কিছু পেয়েছিস্ কি?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "আমার যখন মনে ইচ্ছে হচ্ছে, তখন করবার আপত্তি কি? আর আদেশ? তুমি অনুমতি কর, তা হলেই হল।" একটু ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন, "আর এক কথা, মামা, বড় দাদা গঙ্গালাভের সময় আমাকে বলেছেলেন, মাকে এনে পুষ্পাঞ্জলি দিতে। তাঁর কাছে যদিও আমি সত্যি করিনি, তবু তাঁর কথাটা রক্ষা করা ত চাই।" হৃদয় এইরূপে মাতুলকে বুঝাইতেছেন, ইত্যবসরে তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে কহিলেন, "হৃদু, তুই তিন বৎসর পূজা করবি।"

হৃদয়ের ইচ্ছা—যতদিন জীবিত থাকিবেন তত দিনই শারদীয় পূজা করেন, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "মামা, তুমি অমন কথা কেন বল্‌লে? তুমি বল যে, আমি যতদিন বাঁচব তত দিন যেন দুর্গা পূজা করতে পারি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না।

যে দিবস প্রাতঃকালে এই কথাবার্ত্তা হইল, সেই দিবস বেলা তিন-টার সময় হৃদয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি

মথুরানাথের জমিদারিতে তহসিলের কার্য্য করেন। তিনি আসিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "দেখ্ হৃদু, দুর্গাপূজা করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, তুই কি বলিস ?"

হৃদয়ের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "সে যে অনেক খরচ। এত টাকা কে দেবে ?"

রাঘব কহিলেন, "আমি দেব।" এই বলিয়া তখনি সঙ্গে যত টাকা আনিয়াছিলেন, সমস্ত ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন যে, আরও আবশ্যক হইলে দিবেন। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হৃদু ত আমাকে সকাল থেকে নাচাচ্ছে। আবার তুমিও এসেছ। তা বেশ ত, কর না।" রাঘব তাঁহার অনুমতি পাইয়া হৃদয়কে পূজার সমস্ত আয়োজন করিতে বলিলেন এবং আপনি আপনার কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন। হৃদয় মথুরানাথের নিকট কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সিহোড়ে চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতে গেলেন। যাইবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহার দ্বারা প্রতিমা অতি বিশুদ্ধভাবে নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার নাম করিয়া হৃদয়কে কহিলেন, "তাকে প্রতিমা গড়িতে দিস, আর কারুকে দিস্ নি।"

কিছু দিনের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত হইলে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সিহোড়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি যাব, কিন্তু লোক দেখানে যাওয়া হবে না। আমি যাব, কেবল তুই দেখতে পাবি, আর কেউ দেখ্তে পাবে না।"

হৃদয়ের ইচ্ছা তাঁহাকে একেবারে সঙ্গে লইয়া যান। এজন্য পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যা, তুই ভাবছিস কেন, আমি যাব যখন বল্‌ছি, তখন ভয় নেই। একজন তন্ত্রধারক করে তুই নিজে পূজ করবি, আর সে মন্ত্র পড়াবে। কিন্তু তুই আপনার ভাবে যেমন মা কালীর পূজ করিস, সেই রকম পূজ করবি। আর উপস করিস নি। উপস কর্‌লে মুখে পচা গন্ধ হয়। তুই দুদ গঙ্গাজল আর চিনির পানা খাস্। উপস করিস্ নি।" হৃদয় 'আচ্ছা তাই করব' বলিয়া তথাপি তাঁহাকে যাইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "আমি লোকদেখানে গিয়ে কি করিব? আমি যাব, তুই আমায় দেখতে পেলেইত হল। তবে আর কেউ দেখতে পাবে না।" -এইরূপে হৃদয়কে নিরস্ত করিয়া একজন তন্ত্রধারকও নির্ব্বাচন করিয়া দিলেন। তৎপরে হৃদয়কে বলিলেন, "মথুরকে রাজি কর্‌তে পারিস ত তোর সঙ্গে যাই।" পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মথুরানাথের বাটীতে পূজার সময় তাঁহাকে না লইয়া গেলে পূজা আরম্ভই হয় না। অনেক দিন ধরিয়াই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। হৃদয় মথুরের নিকট তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মতি পাইলেন না সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামত কার্য্য করিতে এক প্রকার সম্মত হইলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচিল না। পূজায় কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবে কি না জানিবার জন্য একটী বিল্বপত্রে 'বিঘ্ন হবে' এবং আর একটীতে 'বিঘ্ন হবে না' লিখিয়া একটি পাত্রের মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী তুলিয়া দেখিলেন, "বিঘ্ন হব না।" এইবার হৃদয় অনেকটা শান্ত হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞামত উপবাস না করিয়া সপ্তমী পূজার দিন স্বয়ং পূজা করিতে লাগিলেন। আরাত্রিকের সময় দেখিলেন, প্রতিমার পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আরত্রিক করিতে লাগিলেন।

পরদিন গ্রামে গ্রামে হৃদয়ের অদ্ভুত আরত্রিকের কথা ঘোষিত হইয়া গেল। অষ্টমী পূজার দিন দলে দলে লোক আসিয়া সন্ধিপূজা ও আরত্রিক দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। সিহোড়ের নিকটবর্ত্তী ফুলুই গ্রামে সাধারণের সুবিধার জন্য সন্ধিপূজার সময় নির্ণয় করিয়া ঠিক সময়ে একটি আতসবাজীর শব্দ করা হইত। সেই শব্দানুযায়ী সকলে পূজা আরম্ভ করিতেন। উক্ত শব্দ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই হৃদয় সন্ধিপূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শব্দ হইবার পূর্ব্বেই প্রতিমার পার্শ্বে তাঁহার মাতুলকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, ঠিক সময় না হইলে কখন মামা আসিতেন না। এই ভাবিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, পূজা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথানুযায়িক কুমড়া আক ও শশা বলি প্রদান করিলেন। সেই দিবসও আরত্রিকের সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিমার পার্শ্বে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ উন্মত্তভাবে আরাত্রিক সম্পাদন করিলেন। এইরূপে তিন দিবস সমভাবে পূজা করিলেন এবং প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শত লোককে পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ খাওয়াইলেন।

দুর্গোৎসবান্তে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূজার সময় সিহোড়ের সমস্ত ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বর্ণন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আরতি আর সন্ধিপূজার সময় আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে বিদ্যুতের মতন তখনি তোর চণ্ডীমণ্ডপে যেত, আর ভাব হত, আমি ঠাকুরের পাশে দাঁড়াতুম, তুই দেখ্‌তে পেতিস্।" দুর্গোৎসবের

সময় মহাষ্টমীর দিন এমনও ঘটিয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণ সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, ঠিক সন্ধিপূজাটীর সময়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হস্ত দুইটী অমনি বরাভয়করের ভাব ধারণ করিল এবং মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব হাস্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

উলোর বামনদাস মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে দেব বিশ্বাসের উদ্যানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন সংবাদ পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কেবলমাত্র একখানি রক্তবর্ণ গরদের কাপড় ছিল। বামনদাস একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন, প্রত্যহ বহুজনকে অর্থদান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তখন অনেকগুলি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থদান করিতেছিলেন। বামনদাস শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "রাসমণির বাগানে থেকে।" বামনদাস উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া পরে আপনি উপবেশন করিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর অধিক পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। ঈশ্বরানুরাগী বহুলোকেই তখন তাঁহাকে জানেন অথবা তাঁহার বিষয় লোকপরম্পরায় সমস্ত শুনিয়াছেন। ইনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চিনিতে পারিয়া করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, আজ আমার কি সৌভাগ্য, আপনি কষ্ট করে এসে আমায় দর্শন দিলেন! আজ আমার পরম সৌভাগ্য! যদি দর্শনই দিলেন ত অনুগ্রহ করে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "তা বেশ। কিন্তু আগে এই বামুন পণ্ডিতগুলোকে বিদেয় কর, তবে তোমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হবে। তুমি যেন পচা গরু, আর ওরা যেন শুকুনি তোমায় ঘিরেছে। কিন্তু দেখ,

ওদের ভাল করে বিদেয় করো, নইলে তোমার নিন্দে করবে। বামুনরা বড় কম নয়, শ্রীরামচন্দ্রের বে ভেঙ্গে দিয়েছিল"। সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বামনদাস অগ্রে তাঁহাদের বিদায় করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিতে লাগিলেন, "দেখ যজমেনে বামুন কেমন জান? চৈতন্যদেব হরিনাম করতে করতে মহাভাবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। যে সব জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে জালে কোরে তাঁকে তোলে, সেই জাল দিয়ে তাঁকে ছোঁয়ার দরুণ তারা শেষে সবাই 'হরিবোল হরিবোল' করতে লাগল। কোন কাজ কর্ম্ম আর করে না। তাদের লোকেরা বিষম বিপদে পড়ে মহাপ্রভুর কাছে এসে সব কথা জানালে। মহাপ্রভু বল্লেন, "এক কাজ কর, যজমেনে বামুনের ভাত এনে ওদের মুখে দাও। তারা গিয়ে তাই করলে, আর সব ভাব টাব ঘুচে গেল। যেমন জেলে তেমনি হল।"

বামনদাস ইতিপূর্ব্বে ঈষৎ বুঝিয়াছিলেন যে, ভক্তিহীন লোকের সম্মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিবার কারণ আরও স্পষ্ট বুঝিতে পরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বলিলেন, "দেখ, পাহারাওয়ালা আঁধারে ল্যাণ্ঠন হাতে করে সবাইকে দেখে, কিন্তু সে যদি না সেই ল্যাণ্ঠনটী আপনার দিকে ফেরায় ত কেউ তাকে দেখতে পায় না। তেমনি ভগবান্ আপনি যদি দয়া করে না দেখা দেন ত কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু সেই কৃপালাভ করতে হলে কাম কাঞ্চন ত্যাগ করা চাই। নইলে তাঁর কৃপালাভ হয় না।" এইরূপে অনেকক্ষণ ঈশ্বরপ্রসঙ্গের পর রামকৃষ্ণদেব গুটীকতক শ্যামাবিষয়ক গান গাহিলেন। বামনদাস তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

এই সময়ে বড়বাজারের মাড়ওয়ারীগণ দলে দলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেন। ইহাঁদের মধ্যে লছমিপৎ নামে একজন ধনাঢ্য মাড়ওয়ারি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার কাছে আসিয়া ভগবৎকথা শুনিতেন। একদিন তিনি কোন কারণে অনুমান করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তেমন সুচারুরূপে যত্ন করা হয় না এবং তাহার কারণ অর্থাভাব। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার নামে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করিয়া দিতে চাহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে, তাঁহার কোন অভাব নাই এবং অর্থেরও কোন প্রয়োজন নাই। লছমিপৎ তাহা না শুনিয়া অর্থগ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সেই পীড়নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের মতন রোদন করিতে করিতে মা কালীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, এমন লোককে এখানে কেন পাঠাস্ মা, এরা যে তোর কাছ থেকে তফাৎ কোরে আমায় নষ্ট করতে চায় মা।" এবং এইরূপে রোদন করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে দেখিলেন, লছমিপৎ অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার দিকে অপরাধীর ন্যায় তাকাইয়া আছেন। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যদ্বারা তাঁহার সেই ভাব দূর করিলেন। লছমিপতের জ্ঞান জন্মিল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অর্থের কথা আর কখন তাঁহার নিকট উত্থাপন করিবেন না এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব ত্যাগ স্মরণ করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে কলিকার মধ্যবর্ত্তী কলুটোলা নামক স্থানে, সুবর্ণবণিক কালীনাথ দত্তের বাটী একটী হরিসভা সংস্থাপিত হয় এবং তথায় চৈতন্যদেবের একটি আসন রাখা হয়। তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট ও বহুশ্রোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী নিত্য